ফাল্গুন ১৩৮৪

আনন্দমেলা

ক্রিকেটে জয়জয়কার

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-105 BEN

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
ফাল্গুন ১৩৮৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ তৃতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
দেড় টাকা

ছড়া — কিস্‌সা কাঠবিড়ালী কা । অন্নদাশঙ্কর রায় ২৬
ম্যাজিক! ম্যাজিক । গোবিন্দ চক্রবর্তী ৫২

গল্প — ভূতো । অজেয় রায় ৭
বাঘের খপ্পরে ভগবান । গঙ্গেশ বিশ্বাস ৪৬
শকুনের পালক । পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৪৮

বিশেষ রচনা — শীতের দার্জিলিং । রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
ডাকটিকিটে সরস্বতী । পুষ্পেন্দু লাহিড়ী ৬
শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় । দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

আত্মকথা — খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৭

উপন্যাস — বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ১৩
অলৌকিক । বিমল কর ৩৬

কমিক্‌স — ভুতুড়ে গাড়ি ১১, টারজান ২২, টিনটিন ৩০
গাবলু ৫১, নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো — পরাজয় থেকে জয়ে । পুষ্পেন সরকার ৪০
জয়ের পর জয় । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪২
মোহনবাগানের ত্রিমুকুট । মুকুল দত্ত ৪৩
হকির 'জাগলার' । চিরঞ্জীব ৪৪
ষোল বছরের চ্যাম্পিয়ন । সুব্রত সরকার ৪৫

লেখাপড়া — হেস্টিংস হাউস বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য — আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা — ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ১০
তোমাদের পাতা ২৪, মজার পড়া । কুম্ভক ২৫
বিশ্ববিচিত্রা । দিদিমণি ৩৯
আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ শেখো । কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ — মনোজিৎ চন্দ

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, সি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

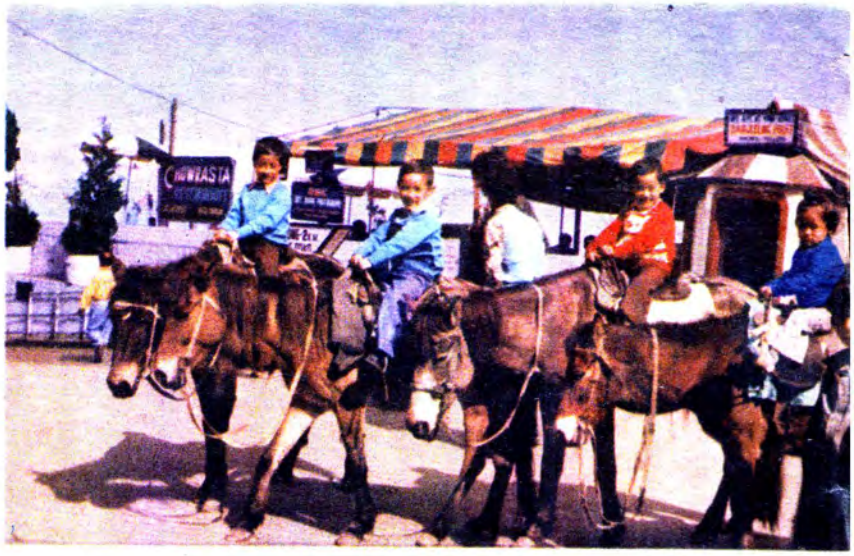

শীতের দার্জিলিং

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো/চিত্তরঞ্জন রক্ষিত

সবচেয়ে কষ্ট সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে। জামা, সোয়েটার, দুটো কম্বল, পায়ে মোজা, এসব সত্ত্বেও তো রাত্তিরে শীতের ঠেলায় পাশ ফেরা যায় না। এপাশ ফিরলে ওপাশের বিছানায় মনে হয় কে যেন জল ঢেলে দিয়েছে। তার ওপর আমি আবার শীত-কাতুরে মানুষ। সকালবেলা ঘুম ভাঙলে কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ভাবলেই দাঁতকপাটি লাগে। আমি আর একবার মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোটেলবয়ের হাঁকডাকে উঠতেই হয়। এই ভেবে বিছানা ছেড়ে ওঠবার মত মনের জোর পাই যে, দরজা খুললেই দেখতে পাব সাজানো ট্রে-তে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সকাল বেলার গরম চা। চা হাতে কাচের জানলার পাশে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে বসি। জানলার কাচ সারারাত জোলো কুয়াশা আর মেঘের সঙ্গে গা ঘষে ঘষে এমনি ঝাপসা হয়ে গেছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জানলা খোলবার উপায় নেই। তাহলেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে হিমালয় থেকে উড়ে-আসা ছুরির মত ঠান্ডা বাতাস, কিংবা এক ঝাঁক অবাধ্য মেঘ, বিছানা-টিছানা সব ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাবে। সমুদ্রতট থেকে প্রায় ৭০০০ ফুট ওপরে দার্জিলিং শহর। সুতরাং বুঝতেই পারছ, দার্জিলিং শহরের ওপর মেঘেদের দাপট কেন এত বেশি। আমাদের কাছে মেঘ চিরকাল সুদূর আকাশের বস্তু, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু দার্জিলিংয়ে গিয়ে দেখবে, মেঘের দল তোমার পাশ দিয়ে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে। এই মেঘেরাই দার্জিলিংয়ে সবচেয়ে বড় মজা। ধরো, চারধারে ঝকঝকে রোদ—শীতকালে দার্জিলিং আবার সবচাইতে ঝকমকে। তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ। এমন সময় উড়ে এল এক ঝাঁক মেঘ। ব্যাস, চতুর্দিক মুহূর্তে অন্ধকার। তোমার পাশের সঙ্গীটিকে পর্যন্ত তুমি আর দেখতে পাবে না। ডিসেম্বরের শেষের দিকে দার্জিলিংয়ে এবার খুব তুষারপাত হয়েছিল। আমি অবশ্য বরফ পড়ার আগেই ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়।

যে-কথা বলছিলাম জানলার ঝাপসা আর বরফের মত ঠান্ডা কাচে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখলাম চিকচিকে নীলচে রঙের রোদ উঠেছে—দেখলেই বোঝা যায়, এই রোদে আলো আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই। একেই হয়তো বলে লেবু-পাতার মত নরম রোদ, যদিও এখন অনেক বেলা, প্রায় দশটা। রঙ-বেরঙের গরম জামা পরে অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, আমার জানালার এক পাশে ঝকঝক করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আপাদ-মস্তক সাদা উজ্জ্বল বরফের চাদর জড়ানো। অন্য পাশে সুদূর একটি গির্জার চূড়ো, মেঘের বুকে বর্শার ফলকের মত বিঁধে আছে। ইস্, আরো আগে কেন ঘুম ভাঙল না আমার ? তাহলে ভোরবেলার প্রথম আলোয় সত্যিই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সোনার তৈরি মনে হয় কিনা দেখতে পেতাম! মনে মনে ভাবলাম কাল খুব সকালে উঠে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতেই হবে। এমন সময় একটি মুর্গি ডেকে উঠল, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যেন জানিয়ে দিল আমাদের। সে কী, দার্জিলিংয়ের শীতের ঠেলায় মুর্গিরাও বুঝি এত বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে ?

লক্ষ করলাম, দার্জিলিংয়ে বেড়ালের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার—এরকম বেড়ালহীন শহর যে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারে আমার ধারণা ছিল না। এবং যে দু-একটি বেড়াল আমি কদাচিৎ দেখেছি, তারাও প্রচন্ড শীতে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপচাপ বসে থাকত। তবে দার্জিলিংয়ে রাস্তার কুকুরেরাও যে কী সুন্দর, ভাবতে পারবে না—নরম, গোলগাল আর তাদের গা-ভর্তি ঝুম-ঝুমে লোম। বিশেষ করে বাচ্চা কুকুরগুলোকে তো কোলে তুলে আদর না-করে পারা যায় না। ভেবেছিলাম, দু-একটিকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কিন্তু অনেকেই বললেন, ওরা নাকি কলকাতার গরমে বাঁচবে না।

বেলা এগারোটা নাগাদ রোদের জোর দেখে মনে হল, গরম জামা-কাপড় পরে এবার রাস্তায় বেরনো যায়। কিন্তু তৈরি হতে-হতে আবার একরাশ কুয়াশা কোথা থেকে এসে চারধার অন্ধকার করে দিল। যাই হোক, ক্যামেরাটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে দু-পা গেলে দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, মল্ (mall)। চারধারে ঘেরা বেড়ানোর জায়গাকে ইংরেজিতে বলে mall। অনেকে উচ্চারণ করেন ম্যাল। কিন্তু 'দ্য ম্যাল' বললে লন্ডনের সেন্ট জেমস পার্ক বোঝায়—অন্য সব ক্ষেত্রে mall-এর উচ্চারণ মল্। অনেক বড় বাঁধানো উঠোনের মত দার্জিলিংয়ের মল্—চারধারে বাহারি আচ্ছাদনের তলায় বেঞ্চি পাতা, আর মলের ঠিক মাঝখানে একটি সুন্দর ফোয়ারা। ফোয়ারা থেকে একটু দূরেই একটা সুন্দর কফি খাওয়ার জায়গা আছে। উলটো দিকের ছোট্ট রেস্তোরাঁয় মাদ্রাজী দোসা পাওয়া যায়। তারই পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা নেমে গেছে তার শেষে চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি, স্টেপ অ্যাসাইড, যেখানে তিনি মারা যান।

মল্-এর অন্যতম আকর্ষণ হল ঘোড়ায় চড়ার মজা। সামান্য টাকায় যে-কেউ ঘোড়ায় উঠে মল্-এর চারপাশে চক্কর দিতে পারে।

ছোট ছেলেমেয়েরা যারা দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যায় তাদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি খেলা জমে ওঠে মল-এ। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা—তিব্বতী, ভুটিয়া, নেপালী ইত্যাদি—অধিকাংশই গরিব, তাদের জামাকাপড়ের খুব একটা আড়ম্বর বা বাহার নেই। কিন্তু আমি মল্-এর বেঞ্চিতে বসে দেখি ওরা কত রকম নতুন-নতুন খেলা খেলে, এবং যে-সব ছেলেমেয়ে বেড়াতে এসেছে তাদের পেলে ওরা কত খুশি হয়। শুধু এক-মাত্র সমস্যা ভাষা। একদিন দেখি একটি ছোট্ট ভুটিয়া ছেলে তার থেকেও ছোট্ট একটি আমেরিকান ছেলের সঙ্গে সাইকেল নিয়ে দারুণ খেলা করছে—আর কথা বলছে ইশারায়, কেননা কেউ কারো ভাষা বোঝে না। আমি একদিন দার্জিলিংয়ের একটি ছোট্ট গরিব ভুটিয়া মেয়েকে একটি আনন্দমেলা উপহার দিলাম। সে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলো দেখল, তারপর নিজের ভাষায় আমায় যা বলল তার বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝলাম না। কিন্তু বোঝা গেল, সে ভীষণ খুশি হয়েছে। এবং তার বন্ধুদেরও আমার সঙ্গে ভাব করিয়ে দিল।

দুপুর থাকতে-থাকতেই রওনা হলাম লয়েডস বোটানিকাল গার্ডেনস-এর উদ্দেশে। তোমরা যদি এপ্রিল-মে মাসে আসো তবে দেখবে এখানে ফুলের বাহার। কিন্তু শীতকালে অত বেশি ফুল দেখলাম না। ঘুরে-ঘুরে অনেক নীচে পর্যন্ত পথ চলে গেছে—চারধার শুধু ঘন ঠান্ডা সবুজ গাছে ঢাকা। আর তারি ফাঁকে-ফাঁকে কোথাও-কোথাও অজস্র রঙিন ফুল বা রঙ-বেরংয়ের পাতার বাহার। কোনো ফুলের নাম 'বার্ড অফ প্যারাডাইস', এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কোনোটির নাম 'গার্ডিনিয়া' আর ৫

ডাকটিকিটে সরস্বতী

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

১৯৭৫ সালে বিশ্ব হিন্দী ও তেলেগু সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় ডাকবিভাগ থেকে প্রচারিত দুটি ডাকটিকিটে হিন্দী ও তেলুগু লিপিমালার পটভূমিকায় সরস্বতীর ছবি ছাপা হয়েছে। সরস্বতী মূর্তিটি বিকানীর রাজ্যের চৌহান যুগের স্বাদশ শতকের একটি ভাস্কর্য। ডাকবিভাগ জানিয়েছে যে, সরস্বতী যেহেতু ভাষা ও জ্ঞানের দেবী, সেই জন্যে সম্মেলন উপলক্ষে ডাকটিকিটে সরস্বতীর ছবি ছাপা হয়েছে।

দু হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষেরা ব্যবসা বাণিজ্য করত। এবং এইভাবে এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের পণ্য-দ্রব্যও যেমন সেখানে সাদরে গৃহীত হয়েছিল, ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মও সেখানে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্যে ইন্দোচীন (লাওস, ভিয়েতনাম, ক্যাম্বোডিয়া)। ইন্দোনেশিয়া (জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি), মালয়, শ্যাম—এইসব দেশে আজও দেখা যায় মঠ আর মন্দির। এদের কাব্য-সাহিত্যেও ভারতের ধর্ম এবং পৌরাণিক কথা দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬৫ সালে শ্যামদেশ 'আন্তর্জাতিক পত্র-লিখন সপ্তাহ' উদযাপন করে দুটি ডাকটিকিট প্রচার করেছে। ছবিতে রয়েছে পৃথিবী আর চিঠি লেখার খাম, মাঝখানে আঁকা আছে বিদ্যাদেবীর ছবি। এই বিদ্যাদেবী ভারতের সরস্বতীরই আর এক রূপ।

লাওস দেশটি আগে ইন্দোচীনের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র। এই দেশের সঙ্গেও একসময় ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। লাওসেরও অনেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৪ সালে লাওস দেবী সরস্বতীর চিত্র-সম্বলিত চমৎকার একটি ডাকটিকিট বার করেছে। নকশায় দেখা যাচ্ছে সরস্বতী উড়ে চলেছেন মেঘের রাজ্যে, তাঁর চার হাতে যথাক্রমে রয়েছে পদ্মকলি, অমৃতপাত্র, পুঁথি ও বীণা।

কোনোটি দক্ষিণ আমেরিকার 'বোমারিয়া ক্যালডাসিয়ানা'। মজার গাছ 'ড্রুপিং উইলো'। গাছটার দিকে দেখলেই মনে হয়, গাছটা দুঃখে মুহ্যমান। চীন দেশের গাছ 'থিয়া সিনেনসিস' প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'গিনকগো বিলোবালিন' পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছেদের একটি। ১৬০,০০০,০০০ বছর আগে এই গাছ প্রথম পৃথিবীতে দেখা যায়। দার্জিলিংয়ের বোটানিকাল গার্ডেনস-এ 'কনিফেরে মেটাসেকুওইয়া' বলে এক কিম্ভূত নামের গাছ দেখলাম যার পূর্বপুরুষেরা ২০০,০০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে জন্মেছিল।

বোটানিকাল গার্ডেনস-এ যেতে গেলে যেমন অনেকক্ষণ ধরে নীচের দিকে নামতে হয়, হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউট-এ যেতে গেলে তেমনি উঠতে হয় একটানা চড়াইয়ের পথ। পাহাড়ে ওঠা শেখার এই স্কুলে আসতে গেলে একটা ছোটোখাটো পাহাড়ে উঠতে হয়, কেননা স্কুলটা তৈরি হয়েছে জওহর পর্বতের ওপরে। এখানে ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে ওঠা শিখতে আসে। এই স্কুলের সবচেয়ে উঁচু পদে রয়েছেন স্বয়ং তেনজিং নোরগে। তোমাদের মধ্যে যারা পাহাড়ে ওঠা বা মাউনটেনিয়ারিং শিখবে, তাদেরও কিন্তু এখানেই আসতে হবে।

মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউট-এ একবার এলে মানুষের হিমালয়-অভিযানের দীর্ঘ ইতিহাসটা চোখের সামনে একেবারে জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এই মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউট-এর সঙ্গে লাগোয়া কিন্তু পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্ক। কিন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানা যারা দেখেছে তাদের কাছে এটা কিছু না।

রাত আড়াইটের সময় যখন ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, আর শুনতে পেলাম কে যেন চেঁচিয়ে বলছে 'টাইগার হিল টাইগার হিল' মনে মনে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল—কেন যে মরতে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার ইচ্ছে হল। যাই হোক, গাড়ির ভাড়া যখন আগে থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যেতে আমাকে হবেই। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে ল্যান্ডরোভারে করে বেড়িয়ে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ। কুয়াশার পর্দায় হেডলাইট ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। তবু গাড়ি চলছে সোঁ-সোঁ করে। বাঁ ধারে ঘন জঙ্গল। ডান ধারে গভীর খাদ। আমাদের ১১ কিলোমিটার পথ পাহাড়ী পথে ঘুরে-ঘুরে উঠতে হবে টাইগার হিল-এ পৌঁছতে হলে। বাতাস ঠিক বরফের ছুরির মত।

টাইগার হিল-এ গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখনো সূর্য উঠতে ঘণ্টা দুই দেরি আছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভিড় জমে গেছে। আমি ঠাণ্ডার ঠ্যালায় কাঁচের ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দেখি সেখানে সুন্দর চায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এত রাতে পাহাড়ের ওপরে এই দারুণ ঠাণ্ডায় আমাদের জন্য যে কেউ চা বানাতে পারে সেটা ভাবতেও ভাল লাগল। ক্রমশ-ক্রমশ প্রচণ্ড ভিড় বাড়ল। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে সূর্য-ওঠা দেখতে। সূর্যের জন্যে এমনি করে কখনো প্রতীক্ষা করিনি এর আগে। হঠাৎ শুনতে পেলাম মৃদু বাজনার শব্দ। একটি স্থানীয় যুবক তার গীটারটি নিয়ে এসেছে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে বাজাবে বলে। হঠাৎ আকাশের মেঘে-মেঘে রঙ লাগল। লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, গোলাপি—মনে হচ্ছে, হাজার-হাজার ফুল একসঙ্গে ফুটে উঠছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলাম হাজার মানুষের বিপুল হর্ষধ্বনি—চেয়ে দেখি আমার সামনের বিরাট পাহাড়টির গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জ্বলন্ত সোনা। সবাই বলল, ঐ দ্যাখো, কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিন্তু আমি দেখলাম আরো অনেক অনেক দূরে আর এক আশ্চর্য ঘটনা। পাহাড়ের একটি বরফ-ঢাকা নিঃসঙ্গ চূড়ো একেবারে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় রক্তবর্ণ আলোর টিকা। এভারেস্ট ছাড়া অত উঁচুতে আর কোন পাহাড় মাথা তুলতে পারে? আর একটু পরেই সূর্য উঠবে।

ভুতো

অজেয় রায়

এক ধারে একটা মজা পুকুর, দু পাশে চাষের খেত এবং অন্য ধারে উঁচু-নিচু শক্ত কাঁকুরে ডাঙা। মাঝখানে একফালি ঘাসে-ঢাকা সমতল জমি—বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল গ্রাউন্ড। রামপুর গ্রামের একদল ছোট ছোট ছেলে এইখানে প্রায় সারা বছর ফুটবল খেলে।

ক্লাবের নাম "বটতলা স্পোর্টিং" দেওয়ার কারণ গ্রাউন্ডের পশ্চিম দিকে ওই রুক্ষ ডাঙাভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি প্রাচীন বিশাল বটগাছ।

এক গ্রীষ্মের দিনে, সূর্য সামান্য পশ্চিমে হেলে পড়তেই বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা ফুটবল-বগলে মাঠে এসে উপস্থিত হল। চটপট লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল সবাই, তারপর শুরু হল টিম তৈরি।

একটা গণ্ডগোল বাধল। এ-সমস্যা প্রায়ই ঘটে। মোট পনরো জন ছেলে এসেছে। অর্থাৎ একদিকে থাকবে আটজন, অন্যদিকে সাত। এই রকম বিজোড় সংখ্যা থাকলে টিম ভাগাভাগি নিয়ে প্রথমেই একচোট ঝগড়াঝাঁটি লাগে, অতঃপর কিছু একটা রফা হয়। কিন্তু সেদিন দু দলের ক্যাপ্টেন, নিতাই এবং হারু, দু-জনেই জেদ ধরে বসল, কিছুতেই সাতজনে খেলবে না।

অন্যরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ধুত্তোরি। পা সুড়সুড় করছে তাদের। হঠাৎ গোপাল গ্রাউন্ডের সীমানায় দাঁড়ানো একটি ছেলেকে ডেকে বলে উঠল, "এই, তুই খেলবি? ফুটবল খেলতে জানিস?"

সবার নজর পড়ল ছেলেটার ওপর। কালো, রোগাটে, পরনে মলিন ছিন্ন হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট। বয়স বছর চোদ্দ হবে। মাঝারি লম্বা। বড় বড় চোখ দুটি। মুখখানা বেশ মিষ্টি। কয়েকদিন ধরে এই অচেনা ছেলেটি মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখে। গোপাল জিজ্ঞেস করামাত্র সে ফিক করে হেসে ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হেঁ।"

ব্যাস, সমস্যার সমাধান। নতুন ছেলেটা পড়ল হারুর ভাগে। হারু তাকে বলল, "এই তোর নাম কী রে?"

ছেলেটা উত্তর দিল, "ভুতো।"

শুনে সবার কী হাসি।

হারু বলল, "ভুতো, তুই গোলে খেল।"

ভুতো মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল, "বেশ।"

বটতলা স্পোর্টিংয়ের একজনই মাত্র নিয়মিত গোলকীপার, রবি। সে ম্যাচে গোলকীপিং করে, প্র্যাকটিসে এক দলের গোলকীপার হয়। কিন্তু আর কেউ গোলে খেলতে চায় না। তাদের মতে ফুটবল পায়ের খেলা, হাতে বল ধরে সুখ নেই। তাই রবির উল্টো পক্ষে গোলে কে খেলবে তাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট লাগে। কেউ বেশিক্ষণ গোলপোস্ট আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। অতি বিরক্তিকর কর্তব্য। আবার গোল খেলে গোলির ঘাড়েই যত দোষ চাপে। ফলে রবির প্রতিপক্ষে দু-তিনজনকে পালা করে গোলে পাঠানো হয়। কাউকে একটু বেশি সময় গোলে খেলতে হলেই সে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দেয় যে, তাকে তখন এগিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে গোল রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতে বাধ্য হয় ক্যাপ্টেন। সেদিন রবি গেছে নিতাইয়ের দলে। তাই ভুতো এক কথায় গোলে খেলতে রাজি হওয়ায় হারুর টিমের প্লেয়াররা এই নতুন ছেলেটার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

হারু মনে-মনে একটু চিন্তিত হয়। এই উটকো ছোঁড়া কেমন খেলে, কে জানে। শেষে টপাটপ এক গাদা গোল খেয়ে না ডোবায়। আচ্ছা, দেখা যাক। তেমন বেগতিক বুঝলে না হয় পালটে দেব।

খেলা চলতে-চলতে বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেরা টের পেল, ভুতো মোটেই আনাড়ি নয়। সে রীতিমত ভাল গোলকীপার। কয়েকটা শক্ত শট দিব্যি আটকাল। সবাই বুঝল, ও রবির চেয়ে কোনো অংশে খারাপ খেলে না। বরং একখানা বডি-থ্রো যা দেখিয়েছে, অমন রবিও পারবে কিনা সন্দেহ।

খেলার পর সবাই ভুতোকে ঘিরে ধরল। ওর খেলার প্রশংসাও করল। ভুতো গদগদ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। হারু

বলল, "তুই থাকিস কোথায়?"

"হুই দিকে।" ভুতো বটগাছটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

ও বটগাছটার পিছনে আছে মস্ত আম-কাঁঠালের বাগান। তার পরে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস। তারা কেউ ধোবা, কেউ জেলে, কেউ মিস্ত্রি। কেউ বা চাষের খেতে খাটে। ছেলেরা বুঝল, ভুতো ওই পশ্চিম পাড়ার ছেলে। ওখানকার ছেলেরাও ফুটবল খেলে। তবে তাদের অবস্থা ভাল নয়। সব সময় বল জোগাড় করতে পারে না, তাই নিয়মিত খেলা হয় না। পশ্চিম পাড়ার সঙ্গে এ-দিককার ছেলেদের তেমন ভাবসাব নেই।

নিতাই জিজ্ঞেস করল, "তুই কোন ইস্কুলে পড়িস? কোন ক্লাসে?"

ভুতোর মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, "পড়তাম প্রাইমারিতে, এখন আর পড়ি না।"

পশ্চিম পাড়ার অধিকাংশ ছেলের ভাগ্যই এমনি। তাদের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয় না। অল্প বয়সেই রোজগারের ধান্দায় নেমে পড়তে হয়। বাপ-জ্যাঠার কাজে সাহায্য করে। পড়াশুনা হবে কী করে?

তা যাক্‌গে। ভুতোর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না বটতলা ক্লাবের ছেলেরা। তারা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "তুই প্রত্যেক দিন আসবি খেলতে, বুঝলি?"

মাসে-মাসে পঁচিশ পয়সা চাঁদার কথাটাও তুলল না তারা। যদি ও দিতে না পারে এবং সেই লজ্জায় না আসে!

ভুতো মিটমিট করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে জানাল, "হেঁ, আসব ঠিক।"

এমন একজন খাসা গোলকীপার পাওয়ার সম্ভাবনায় বটতলা ক্লাবের ছেলেরা ভারি খুশি। কেবল রবি এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন মোটেই সুনজরে দেখল না। সে মুখ হাঁড়ি করে রইল।

ভুতো রোজ বটতলা ক্লাবে ফুটবল খেলতে আসতে লাগল। সবার আগে এসে সে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে। বটতলা স্পোর্টিংয়ের ছেলেদের দূরে বল হাতে আসতে দেখলেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিন-দিন তার ফর্ম যেন খুলতে লাগল। সবাই বুঝে গেল, এবার থেকে ম্যাচে গোলে রবির কোনো চান্‌সই নেই, কারণ ভুতো খেলবে।

ভুতো ছেলেটার স্বভাব বেশ ভাল। ঠাণ্ডা, চাল-টাল নেই। যে যা বলে, চুপ করে শোনে। কথা কয় খুব কম। একটু কিছু মজার ব্যাপার হলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসে। খেলার শেষে সন্ধের ঝোঁকে সে একা-একা ঘরে ফিরত। বটগাছের তলা দিয়ে যে সরু পথটা গেছে পশ্চিম পাড়ায়, তাই ধরে চলে যেত।

বটতলা স্পোর্টিং দুটো ম্যাচ খেলল। দুটোই জিতল। গোলে খেলল ভুতো, রবি থাকল রিজার্ভ। একটা রামপুরেরই অন্য পাড়ার টিম, অপরটা ছিল পাশের গাঁয়ের। এ দুটো দল তেমন জোরালো ছিল না। গোলে বল এসেছিল কম। যে কটা এসেছে, ভুতো অনায়াসে আটকাল। এরপর একদিন হারু প্রস্তাব করল, "এবার খালপাড় ইউথের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে দি, কী বলিস?"

রামপুর থেকে মাইল তিন দূরে ভরতপুর গ্রাম। সেখানকার এক ফুটবল দল—খালপাড় ইউথ ক্লাব। রেল লাইনের ধারে খালের পাশে তাদের গ্রাউন্ড, তাই ক্লাবের এই নাম। বটতলার সঙ্গে খালপাড় ক্লাবের চিরশত্রুতা বা চির-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতি বছর দু দলে একবার ফুটবল ম্যাচ হয়। খালপাড় ক্লাবের অবস্থা বটতলার চেয়ে কিছু আহামরি নয়। সেখানেও পনরো-কুড়িজন ছোট ছেলে পুরনো ফুটবল নিয়ে প্রায় বছরভোর পেটাপেটি করে। তবে গত দু বছর বটতলা কিন্তু খালপাড়ের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারছে না। দুবারই হেরেছে। এই বছর খালপাড় ইউথের বটতলা গ্রাউন্ডে খেলতে আসার কথা। কারণ, আগের বছর বটতলা গিয়েছিল ভরত-পুরে। হোম-গ্রাউন্ড এবং ভুতো গোলকীপার, সুতরাং বটতলার প্লেয়ারদের আশা জাগল, এবছর খালপাড়কে তারা একচোট দেখে নেবে। পূর্ব পরাজয়ের শোধ তুলবে। পরদিনই খালপাড় ক্লাবের সঙ্গে বটতলা ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করে বসল।

ম্যাচের তিনদিন আগে রবি একটা খারাপ খবর শোনাল। রবি বলল, "খালপাড়ের জগাকে আমি আজ সকালে দেখলুম পশ্চিমপাড়া থেকে বেরুচ্ছে। হঠাৎ ওর ওখানে যাবার মানে?"

নিতাই বলল, "মানে আবার কী, হয়তো জেলেদের খোঁজে গিছল, মাছ ধরাবে, ওদের তো পুকুর আছে।"

রবি গম্ভীর বদনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানাল, "উঁহু, জগাকে আমি চিনি, বেটার পেটে পেটে শয়তানি। আমার ধারণা, ও গিয়েছিল ভুতোর খোঁজে নিশ্চয়ই ওরা ভুতোকে বাগাতে চায়।"

সর্বনাশ। রবির কথা শুনে অন্যদের টনক নড়ে গেল। ভুতোর খ্যাতি কি খালপাড়ে পৌঁছেছে?

সেদিন বিকেলে ছেলেরা ভুতোকে চেপে ধরল। "অ্যাই, খাল-পাড়ের কোনো ছেলে গিছল তোর কাছে?"

"কই, না।" ভুতো উত্তর দেয়।

হারু উপদেশ দিল, "খবরদার, ওদের কারো সঙ্গে কথা বলবিনে।"

ভুতো ঘাড় নেড়ে জানাল, "বেশ।"

বলাই কিঞ্চিৎ কাঠখোট্টা প্রকৃতির। চোখ গরম করে বলল, "তুই যদি আমাদের লাস্ট মোমেন্টে বিট্রে করে কেটে পড়িস, তবে ভাল হবে না বলে রাখছি।"

"না না, আমি চলে যাব কেন?" ভুতো সচকিত হয়ে বলল, "আমি তোমাদের দলেই খেলব।"

ভুতোর কাছে আশ্বাস পেয়ে বটতলা ক্লাব আপাতত নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু পরের দিন রবি আবার এক সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল মনে। রবি ক্যাপ্টেন হারুর বাড়ি বয়ে এসে জানাল, "আজ সকালে ফের দেখলাম খালপাড়ের গজা পশ্চিম পাড়ার মাঠ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার বল তো?"

হারু কিছু ভেবে না পেয়ে মাথা চুলকোয়। আমতা আমতা করে, "গজা হয়তো হাটে যাচ্ছিল। আর ভয় কী, ভুতো তো কথা দিয়েছে আমাদের ছাড়বে না।" রবি ভুরু কুঁচকে ফিসফিসিয়ে বলল, "কিন্তু যদি ঘুষ খায়?"

"অ্যাঁ?" শুনে হারুর চক্ষু ছানাবড়া। ভুতো গরিব ঘরের ছেলে, দু-চার টাকার লোভে তার পক্ষে ফাঁদে পা দেওয়া অসম্ভব নয়। তখুনি বটতলার কয়েকজন সভ্য জড় হয়ে পরামর্শে বসল।

যা হোক, স্থির হল ভুতো প্রথমে তো নামুক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তবে ভুতো সম্বন্ধে একটা গভীর সংশয় সবার মনে দানা বাঁধে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় ম্যাচ। চারটের মধ্যে খালপাড় ইউথ বটতলায় হাজির হল। তারা সঙ্গে প্রায় কুড়িজন সাপোর্টারও এনেছে। বটতলা গ্রাউন্ডের ছিরি আজ পালটে গেছে। মাঠে পড়েছে চুনের দাগ, চারকোণে লাঠির ডগায় লাল-নীল কাগজের নিশান উড়ছে। টুকরো ইঁট বসিয়ে গোলপোস্টের বদলে, দুটো বাঁশ পুঁতে, তাতে দড়ি টাঙিয়ে বানানো হয়েছে গোল। রেফারিগিরি করার জন্য ধরে আনা হয়েছে কলেজ স্টুডেন্ট বগলাদাকে। বটতলা ক্লাবের জন্য ত্রিশ সাপোর্টারও উপস্থিত।

কালো হাফ প্যান্ট, সবুজ স্পোর্টস গেঞ্জি, সাদা কেডস জুতো, লাল মোজায় সুসজ্জিত, গলায় সুতোয় ঝোলান হুইসিল, বগলাদা ঠিক চারটে-পঁচিশে, দু-জন লাইনসম্যান-সহ গ্রাউন্ডে ঢুকে সজোরে বাঁশি বাজাল—ক্রু-র-র। ব্যাস, দুই পক্ষের খেলোয়াড় মাঠে নেমে পড়ল।

খেলা দারুণ জমে গেল।

আক্রমণ— প্রতি আক্রমণ — উত্তেজিত দর্শকদের চিৎকার —রেফারির ঘন ঘন বংশীধ্বনি—সব মিলিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড। আক্রমণের ভাগ খালপাড় ক্লাবেরই বেশি। খালপাড়ের স্ট্রাইকার মণ্টু অতি ডেনজারাস প্লেয়ার। সে যেমন ছোটে, তেমনি সুযোগ-সন্ধানী। বটতলার স্টপার হারু তাকে ছায়ার মতো গার্ড দিতে লাগল। ভুতো কয়েকটা কিক আটকাল চমৎকার ভাবে।

হাফ টাইমের বাঁশি বাজল। তখনো খেলা ড্র। কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি।

হাফ টাইমের পর খেলা শুরু হতেই বটতলা এক গোল দিয়ে ফেলল। খালপাড়ের গোলের সামনে জটলার মধ্যে নিতাই আচমকা এক কিক মারতেই গোল।

খালপাড় এরপর মরিয়া হয়ে উঠল। বটতলা কোণঠাসা হয়ে কোনোরকমে আক্রমণ ঠেকিয়ে চলল। উঃ, কী অপূর্ব যে খেলতে লাগল ভুতো। দূর থেকে, কাছ থেকে একটার পর একটা শট বটতলার গোল লক্ষ করে ছুটে আসে, আর ভুতো প্রত্যেকটা বাঁচিয়ে দেয়। যেন ও একা লড়ছে গোটা খালপাড়ের বিরুদ্ধে। বটতলার অনেকে মনে মনে ভাবল, এই ভুতোর নামে কিনা বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ রটেছিল, ছিঃ।

খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বার বার ঘড়ি দেখছে রেফারি। এখনো জিতছে বটতলা ওই একটি গোলের ব্যবধানে। জয় প্রায় মুঠোর মধ্যে। সেই উল্লাসে বটতলা একটু আলগা দিয়ে ফেলল, এবং পরিণতি হল মারাত্মক।

মণ্টুকে ছেড়ে রেখে হারু খানিক সরে গিয়েছিল। সেই

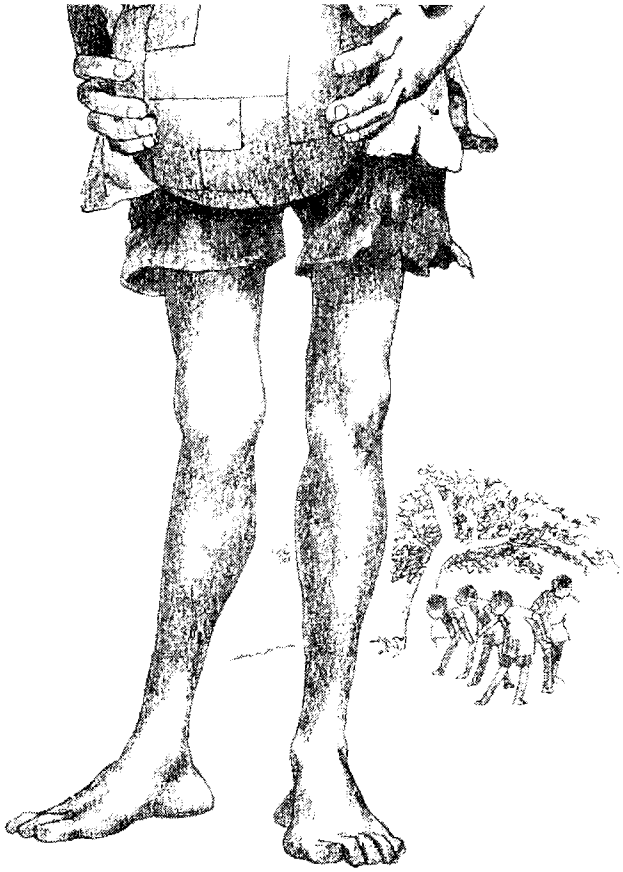

ফাঁকে মণ্টু একটা বল পেয়ে তীব্র বেগে সোজা ছুটল বটতলার গোলের দিকে।

ভুতো একটু এগিয়ে এসে অল্প ঝুঁকে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াল। মণ্টু কিন্তু নিজে গোলে কিক নিল না। ভুতোর ঠিক সামনে এসে, গতি একটু কমিয়ে, চট করে বাঁ পাশে আড়াআড়ি ভাবে ঠেলে দিল বল। খালপাড়ের লেফট-আউট দৌড়ে আসছিল মণ্টুর পাশে পাশে। সে বল ধরল এবং এলোপাতাড়ি কিক না মেরে বল ঠেলে দিল ফাঁকা গোল লক্ষ করে।

ভুতো ডাইনে তাকিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে দেখল, বল আস্তে-আস্তে গড়িয়ে গোলে ঢুকছে, তার থেকে প্রায় দশ হাত দূর দিয়ে ডান গোলপোস্ট ঘেঁষে।

"গো-ও-ল," গগনভেদী গর্জন ছাড়ল খালপাড়ের সমর্থকরা।

ভুতো প্রাণপণ চেষ্টায় ডান দিকে কাত হয়ে বাড়িয়ে দিল হাত। কিন্তু হায়, বল যে তার নাগাল থেকে অনেক বাইরে।

তখুনি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। মাঠের সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখল, এক ফালি রবারকে টানলে যেমন লম্বা হয়ে বেড়ে যায়, তেমনি ভুতোর হাত দুখানা হঠাৎ দশগুণ লম্বা হয়ে গিয়ে, গোল লাইন অতিক্রম করার ঠিক আগে বলটাকে আঁকড়ে ধরে সাঁত করে টেনে নিল তার বুকে। তৎক্ষণাৎ তার হাত দুটোও গুটিয়ে আগের মতো ছোট হয়ে গেল।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার ঘোর কাটতে সবার কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল। "ওরে বাপ রে!" প্রথমেই রেফারি বগলাদা এক আর্তনাদ ছেড়ে মারল টেনে দৌড়। সোজা পুকুরপাড় দিয়ে ঝোপঝাড় টপকে সে হাওয়া হয়ে গেল। তারপরই খালপাড় ক্লাবের খেলোয়াড়রা "ওরে বাবা রে, ভূত রে, খেয়ে ফেলল রে," বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে মাঠ ছেড়ে দিল ছুট। সঙ্গে সঙ্গে বটতলার খেলোয়াড়রাও দিশাহারার মতো পালাতে লাগল। দর্শককুলও পলকে অদৃশ্য হল।

হারু নিতাই ইত্যাদি বটতলার পাঁচ-ছয়জন ছেলে খালপাড়ের ছেলেদের পিছনে পিছনে দৌড়চ্ছিল ধানের খেতের ভিতর দিয়ে। সিকি মাইলটাক গিয়ে তারা থেমে

পড়ল। খালপাড়ের ছেলেদের গতি অবশ্য স্তব্ধ হল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় সটান ভরতপুরে পৌঁছে থামবে।

হারুরা ফিরে তাকাল।

জনশূন্য মাঠে ভুতো একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বল। তার ভঙ্গিতে ও মুখের চেহারায় ভারি অপ্রস্তুত ও বিষণ্ণ ভাব। ভুতো তেড়ে আসছে না দেখে হারুরা সেখানেই দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতে থাকে।

ভুতো একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। তারপর সে বলটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল পশ্চিম দিকে। যেতে যেতে বটগাছের নীচে পৌঁছে সে যেন চকিতে উবে গেল বাতাসে।

আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে বটতলার কয়েকজন অতি সাহসী ছেলে পায়ে-পায়ে এগিয়ে মাঠে ঢুকে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এল।

এরপর কয়েকদিন বটতলা ক্লাবের সভ্যরা আর তাদের গ্রাউণ্ডের কাছে ঘেঁষেনি। তবে মাঝে মাঝে বিকেলে দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে আসত, ভুতো এসেছে কিনা।

ভুতোর দেখা না পেয়ে, দিন পনেরো পরে ছেলেরা আবার ভরসা করে বটতলার মাঠে গিয়ে খেলা শুরু করল। কাঁহাতক আর বিকেলে ফুটবল না খেলে থাকা যায়। তাদের আর কোনো গ্রাউণ্ডও নেই। প্রথম-প্রথম খেলার সময় তারা অবশ্য বেশ ভয়ে-ভয়ে কাটাত, যদি ফের ভুতোর আবির্ভাব হয়? কিন্তু আর কখনো আসেনি।

ওই বটগাছের ছায়াঘেরা অন্ধকার কোনো ডালে লুকিয়ে বসে, কিংবা অন্য কোথা থেকে, ভুতো হয়তো করুণ নয়নে ছেলেদের খেলা দেখত।

ছবি বিমল দাশ

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

এক সময়ে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু ক্লাস সিক্স-সেভেনের ছেলেদের খুব বড় বলে মনে করতেন, রীতি-মত সমীহ করে চলতেন তাদের। একবার ক্লাস টু'তে পড়ার সময় ক্লাস সেভেনের একটি ছাত্র ডোডোবাবুকে তার চশমা রাখতে দিয়ে ইস্কুলের মাঠে ভলিবল খেলতে নেমেছিল, অত সম্মানিত ডোডোবাবু আর কখনো বোধ করেননি। তাতাইবাবুর জীবনস্মৃতিও একই রকম, ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় ক্লাস সেভেনের ছেলেদের সঙ্গে একই ঘরে তাঁর পরীক্ষার সিট পড়েছিল, তাতাইবাবু যে কী গর্বিত হয়েছিলেন তা বলার নয়।

মজার কথা, এখন ডোডোবাবু সিক্সে এবং তাতাই-বাবু সেভেনে উঠেছেন। কিন্তু কেন যেন নিজেদের তেমন বড় মনে হচ্ছে না, টেন-ইলেভেনের ছেলেদের তুলনায় নিজেদের খরগোশের মত মনে হচ্ছে। তবে নতুন বছরের বই কেনার পর তাতাইবাবু নিজেকে একটু চওড়া বোধ করছেন। সিক্সের শাখানদী থেকে সেভেনের মহাসাগরে এসে তাতাইবাবু আর কূল পাচ্ছেন না। ইংরেজির বই সাত রকম, বাংলার বই আট রকম, শুধু অঙ্কে নিস্তার নেই, তার সঙ্গে বীজগণিত জ্যামিতি। তাতাইবাবু রেগে নাম দিয়েছেন হাবিগণিত আর জাবিগণিত। ইতিহাস, ভূগোল এই সবই দুটো-তিনটে করে ম্যাপবই সমেত। তা ছাড়া বিজ্ঞানের দুটো বই, এর মধ্যে একটা হল ভৌত বিজ্ঞান। বইটা বাজারে পাওয়া যায়নি। তাতাই-বাবুর ধারণা, এই বইটা খুব রহস্যময় ছমছমে গোছের হবে, অন্তত নাম পড়ে সেই রকম মনে হচ্ছে।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক হল সংস্কৃত। বিদ্যাসাগরের নাম দেখে তাতাইবাবু ধরে নিয়েছিলেন, ব্যাকরণ কৌমুদী বইটা বর্ণপরিচয়ের মতই অজ-আম-ইট, একেবারে জলের মত সোজা। কিন্তু বই খুলেই চোখ চড়কগাছ, বাংলা হরফে এসব কী শব্দ, নরঃ নরৌ নরাঃ, শোচতি শোচতঃ শোচন্তি। তাড়াতাড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণ বন্ধ করে দিয়ে তাতাইবাবু সংস্কৃতের গদ্য বই খুলে অ আ ই ঈ রপ্ত করতে ব্যস্ত হলেন। অক্ষরগুলো বেশ মজার মজার। অবশেষে ক্লাস সেভেনে উঠে তাতাই-বাবু আবার নতুন করে অ আ ক খ পাঠ শুরু করলেন; বড় হতে আরও কত দেরি হবে কে জানে? আর ডোডো-বাবু, তাঁর বড় হতে স্বাভাবিকভাবেই তাতাইবাবুর চেয়ে আরও এক বছর বেশি লাগবে।

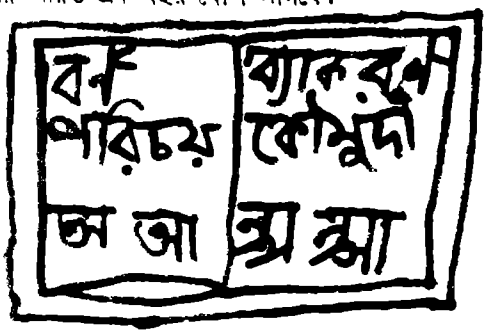

ভুতুড়ে গাড়ি

বিশ্বাসঘাতক হক্ শাসাতে থাকে...
দশ মিনিট! মাত্র দশ মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে!

যা করতে পারেন করুন মিঃ হক্। বাড়ি আমরা ছাড়ছি না!

দিব্যি আরাম করে খাওয়াদাওয়া করছে নিকোলে আর উইল্যোবি...একটা গাড়ির হর্নের শব্দে চমকে ওঠে তারা...
কারও কোনও বিপদ ঘটেছে?
হার্বির হর্ন!
পাঁক!
পাঁক!
পাঁক!

ওর সঙ্গে যেতে বলছে! ঢুকে পড়ো!
RESTAUR
NT
পাঁক!
পাঁক!
পাঁক!
53
53

হার্বি ছুটতে থাকে বিপন্ন মিসেস স্টেইনমেৎসের বাড়ির দিকে... তার সঙ্গে যোগ দেয় আর একটা ছোট গাড়ি...আরও একটা...
ব্যাপারটা লক্ষ করেছ?
পাঁক!
53
53

শহরের ঐ মডেলের সমস্ত গাড়ি তাদের সর্দার হার্বির যুদ্ধের ডাকে বেরিয়ে আসে...
পাঁক!
53
7-14

তার মালিককে বাঁচাবার জন্যে তীরবেগে ছুটে চলে হার্বি...
পাঁক!
পাঁক!

ইতিমধ্যে...মিসেস্ স্টেইন্মেৎসের বাড়িতে
...মিসেস্ স্টেইন্মেৎস্ ...আর মাত্র এক মিনিট...
27
পাতা ওল্টাও..

আর একটা গাড়ি এসে যোগ দেয় তার পিছনে...
প'ক্!
প'ক্!
প'ক্! প'ক্!
প'অঅক!
তারপর...একের পর এক...একের পর এক...
প'ক!
প'ক্! প'ক্!
প'ক!
প'অঅক!
হকের লোকজন ভাঙচুরের কাজ শুরু করতে যাবে...মিসেস স্টেইনমেৎস্ আর তাঁর বন্ধু পালটা জবাব দিলেন...
হুউশ্!
জলের আর এক তোড় এসে লাগে আর-একজন বাড়ি-ভাঙিয়ের গায়ে...
হুউশ্!
হায়, শেষ পর্যন্ত জলের পুরনো পাইপটা ফেটে যায়!
Distributed by King Features Syndicate
লাগাও! বেশ জোরসে ঘা লাগাও!
বিরাট বিরাট যন্ত্রগুলো বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চলেছে...এমন সময় হার্বি আর তার দলবল এসে হাজির...
প'অঅক!
প'ক!
প'ক!
মুহূর্তে সেই গাড়ির দঙ্গল এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়াল...
প'অঅক!
প'অঅক্!
অ্যাঁ!
প'ক!
প'ক!
প'ক!
প'ক!
প'ক!
প'অঅক!
প'অঅক!
প'অঅক!
আগামীবারে সমাপ্য

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গোগোল গতকাল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, ওদের বিল্ডিংয়ের আট-তলার ডাবুদার হারিয়ে যাবার কথা শোনার পর থেকেই আর কিছু ভাবতে পারছে না। ডাবুদা ওর থেকে বয়সে বড়, ক্লাস এইটে পড়ে, আর তার থেকেও বড় আজে-বাজে লোকদের সঙ্গে মেশে। গোগোল ডাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে, পুলিস-অফিসারদের কথা শুনেছিল। বিশেষ করে ছতলার হনুমন্তিরাজী বলেছিলেন, ডাবুকে হয়তো কোনো খারাপ লোক ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। এবার অনেক টাকার মুক্তিপণ দাবি করবে। ডাবু এসব কথা ওর বন্ধু জর্জ, গোগে, সুমিত, পারভেজ আর টুকাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু কোন কূলকিনারা করতে পারেনি। এসবের ফাঁকেই, সাততলার মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরে ও নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। মহেশানিরা সকলেই দিল্লিতে গিয়েছেন, তাঁদের কাজের লোক চান্দা সিং ছাড়া। গোগোলের কাছে বন্ধ ঘরের আওয়াজগুলো খুবই অদ্ভুত আর সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। দরজার ইয়েল লকের ছিদ্রে কয়েকবার উঁকি দিয়ে পর্দা ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে একবার পর্দাটা তোলা এবং ভিতরে টিমটিমে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আর পর্দাটা যেন হঠাৎই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। চান্দা সিং কি তাহলে ভিতরেই ছিল? অথচ একটা অচেনা লোককে ও কয়েকবারই বিল্ডিংয়ের ওপরে-নীচে ওঠানামা ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল, যার পরনে ছিল ডোরাকাটা শার্ট কালো ট্রাউজার। গোঁফওয়ালা লোকটাকে অনেকটা ড্রাইভারের মতো দেখতে। সে নাকি চান্দা সিংয়ের মামা। লোকটা দু ঘণ্টা ধরে নাকি মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে পাচ্ছিল না, তারপরে বন্ধ দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও চান্দা সিংয়ের সাড়া পায়নি। এ ব্যাপারটাও যেন কেমন গোলমেলে। আজ সকালে হনুমন্তিরাজী গোগোলদের ফ্ল্যাটে এসে বাবা-মাকে বললেন, ডাবুদার বাবাকে গতকাল রাত্রি দুটোর সময় কে একজন টেলিফোন করে বলেছে, ডাবুকে তারা আটকে রেখেছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই ছেড়ে দেবে। সে আরও বলেছে, তারা সব সময় ডাবুদাদের ফ্ল্যাটের দিকে লক্ষ রেখেছে, টেলিফোনে আড়ি পেতেছে। ডাবুদার বাবা পুলিসকে খবর দিলে তারা সবই জানতে পারবে, তখন ডাবুদাকে তারা মেরে ফেলবে। ডাবুদার বাবা হনুমন্তিরাজীর টেলিফোন থেকে পুলিসকে সবই জানিয়েছেন। এখন ছদ্মবেশী ডাকাত আর পুলিসের মধ্যে একটা চোর-চোর খেলা চলেছে। এই পর্যন্ত শুনে গোগোল আজ ইস্কুল চলে এসেছে। ইস্কুলে এসে একটা কথা ভেবে ও মনে-মনে ভীষণ চমকে উঠল। হনুমন্তিরাজী বলছিলেন, যে-লোকটা রাত্রে টেলিফোন করেছিল সে নাকি অবাঙালী, ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলেছিল। কথাটা ভেবে বারেবারেই চান্দা সিংয়ের মামার কথা মনে পড়তে লাগল। কেন এরকম মনে পড়তে লাগল? তারপর—

৯

গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, বই খাতার ব্যাগটা কোন-রকমে পড়ার টেবিলে রেখেই মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, ডাকাতদের কথা আর-কিছু জানা গেল?"

মায়ের মুখে যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর ভয় চেপে আছে। গম্ভীর স্বরে বললেন, "না। ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে খেতে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মায়ের ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর সে-ভয় নিশ্চয় ডাবুদার কথা ভেবেই। কিন্তু গোগোলের সঙ্গে মায়ের কী কথা থাকতে পারে? গোগোল কি কিছু অন্যায় করেছে? ও ঘরের মধ্যে ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে অন্য জামা-প্যান্ট পরতে পরতেই দেখল, মা বইখাতার ব্যাগ থেকে ক্লাস টিচারের মন্তব্যের খাতাটা বের করে নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন। গোগোল বেশ ঘাবড়ে গেল। কারণ আজ প্রত্যেক ক্লাসেই ও ছিল অমনোযোগী, যার ফলে রীতিমতো জানা পড়াগুলোই ও বারে-বারে ভুল করেছে। যে-সব অঙ্ক ও অনায়াসে করতে পারে, তাও ভুল করেছে। ও দেখল, খাতা দেখতে-দেখতে মায়ের ভুরু কুঁচকে উঠছে। গোগোল জানে, উঠবেই। লিখিত জবাব আর অঙ্কের পাতায় প্রচুর কাটাকুটি, আর আণ্টির মন্তব্য লেখা আছে, "আনমাইণ্ডফুল।"

গোগোল ভয় পেল, মা এখুনি রেগে ঝেঁজে কিছু বলবেন। কিন্তু আশ্চর্য, মা গম্ভীর স্বরে কেবল বললেন, "আজ যে এরকম হবে আমি আগেই জানতাম।" বলে খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গোগোল মনে-মনে অবাক হল। মা সাধারণত পড়াশোনার অমনোযোগের ব্যাপারে এত সহজে ছেড়ে দেন না। মা সেরকম কিছু বললেন না দেখে, গোগোল যেন মনে-মনে আরও বেশি অপরাধী হয়ে গেল। অথচ ও ইচ্ছা করে কিছুই করেনি। ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে, আর তা না পেলে ডাবুদাকে মেরে ফেলবে, —এই সমস্ত ঘটনা ওর মাথায় এমন বিঁধে আছে, পড়াশোনার দিকে মনোযোগই দিতে পারেনি। কাজটা খুবই অন্যায়, তবু ঘটে গিয়েছে। বিশেষ করে আজ রাত্রেই সেই চরম ঘটনা ঘটতে চলেছে। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ডাবুদার বাবা নীহারবাবুর আজ ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলার কথা। তুলেছেন কি?

গোগোল খাবার ঘরে গিয়ে বেসিনে হাত ধুয়ে, পাশেই ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে নিল। বঙ্কিমদা ইতিমধ্যে খাবার টেবিলে মাখন-মাখানো রুটি জেলি আর দুধের গেলাস রেখে দিয়েছে। মা দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের ধারেই। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গোগোলের জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না, ডাবুদার বাবা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছেন কিনা। ও এসে খেতে বসল। আসলে ও মনে-মনে ছটফট করছে, খেয়ে নিয়েই সাততলায় গিয়ে মহেশানিদের বন্ধ দরজার লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে দেখবে। ডাবুদার চুরি যাবার সঙ্গে মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরের আওয়াজের কোন যোগাযোগই থাকতে পারে না। কিন্তু যে ডাকাতটা টেলিফোনে ডাবুদার বাবার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় কথা বলেছিল। ইস্কুলে গিয়ে এ-কথাটা মনে পড়তেই ওর চোখের সামনে বারেবারেই সেই লোকটার মুখ ভেসে উঠেছিল, যে নিজেকে চান্দা সিংয়ের মামা বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে-লোকটাও গোগোলের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় কথা বলেছিল। তার জন্য ওই লোকটাই সেই টেলিফোনের ডাকাত, গোগোল তা ঠিক ভাবছে না। কিন্তু লোকটাকে ওর মোটেই ভাল লাগেনি। গতকাল লোকটার সঙ্গে একবার একলা লিফটে চেপে, তার চোখের চাউনি ওর বাঘের মতো মনে হয়েছিল। লোকটাকে ওর নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল আর ভয়ে কেমন গা ছমছম করেছিল।

গোগোলের আজ সারাদিন ইস্কুলে আরও অনেক কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, মহেশানিদের বন্ধ দরজার ভিতরের শব্দ আর চান্দা সিংয়ের মামা বলে পরিচয় দেওয়া লোকটা, সবকিছুর

শিশুদের-কিশোরদের-যত ছোটদের বই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সব্যসাচী কথাসাহিত্যিক। একই সঙ্গে তিনি বড়দের এবং ছোটদের লেখক। বড়দের লেখাতেও যেমন তিনি অসীম খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি ছোটদের লেখাতেও। বিশেষ করে, ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি তো তুলনাহীন। তাঁর গুটিকয়েক বই ঃ

ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুরে ৩·০০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুম্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪·৫০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
তপন চরিত ৫·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুণ্ট্যাল ১০·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০

ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৮·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ৪·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

মধ্যেই কেমন যেন একটা রহস্য রয়েছে। জর্জ অবশ্য বলেছে, সবটাই গোগোলের ভুল। ডাবুদার হারিয়ে যাবার ঘটনায়, ওর মাথায় নাকি সব আজগুবি চিন্তা খেলছে। কিন্তু চান্দা সিংয়ের মামা লোকটা যে মিথ্যাবাদী এখন আর গোগোলের তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা দু ঘণ্টা ধরে ওপরে-নীচে করে বেড়াচ্ছিল, অথচ মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে পাচ্ছিল না। কেন সে কাউকে জিজ্ঞেস করেনি? তার চলাফেরা দেখে গোগোলের একবারও মনে হয়নি, সে মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মিথ্যা কথা বলেছিল। কেন বলেছিল? গোগোলের মনে আরও সন্দেহ, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের মধ্যে চান্দা সিং রয়েছে। সে যদি নাও থাকে, অন্য কেউ নিশ্চয়ই রয়েছে। কে থাকতে পারে?

গোগোল ক্লাসে বসে এ কথা পর্যন্ত ভেবেছে, চান্দা সিংয়ের মামা বলে যে লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছে, সে-ই টেলিফোনের সেই ডাকাতটা নয় তো? হয়তো সে মিথ্যা কথা বলে ওইভাবে সারা বিল্ডিং ঘুরে-ঘুরে ডাবুদাদের ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখছিল। লক্ষ করছিল কে কখন যায় আসে, বা কারা কোথায় কী বলাবলি করছে। টেলিফোনে ডাকাতটা সেইরকমই বলেছে যে, তারা সব সময় ডাবুদাদের আর তার বাবার চলাফেরার দিকে নজর রাখছে। লোকটাকে সন্দেহ করার কারণ সে মিথ্যেবাদী আর তাকে দেখলেই খারাপ লোক মনে হয়।

"শোনো গোগোল।" মা ডাকলেন।

গোগোল চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ মা।"

মা বললেন, "তুমি খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছ, খাচ্ছ না কেন?"

গোগোল কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল। মা বললেন, "সকালবেলা হনুমন্তিয়াজী আমাদের এখানে যা বলেছিলেন, সে-সব কথা তুমি কাউকে বলনি তো?"

গোগোল মাথা নাড়তে গিয়ে থমকে গেল। মায়ের কাছে এরকম মিথ্যা কথা ও বলতে পারে না। বলল, "বলেছি।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলেছ?"

গোগোল বলল, "ইস্কুলের বন্ধুদের কাছে ডাকাতদের টেলিফোনের কথা বলেছি।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "আর কী বলেছ?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "আর তো কিছু বলিনি।"

মা বললেন, "ঠিক বলছ তো? ডাবুর বাবা যে হনুমন্তিয়াজীর টেলিফোন থেকে পুলিসকে সব কথা জানিয়েছেন, সে-কথা বলনি?"

গোগোলের স্পষ্ট মনে আছে, ও-সব কথা সে ইস্কুলের বন্ধুদের বলেনি। তবে জর্জ টুকাই পারভেজ গোগো আর সুমিতকে বলবে ভেবে রেখেছে। ও বলল, "না মা, ওসব কোন কথাই বলিনি।"

মা বললেন, "তোমার বাবা খুব ভাবছিলেন। কারণ এসব কথা এখন বাইরে একদম জানাজানি হওয়া উচিত নয়।"

গোগোল আগে এরকম ভাবেনি। এখন মনে হল মা ঠিকই বলেছেন। বাবা ঠিকই ভেবেছেন। কারণ হনুমন্তিয়াজী সকাল-বেলা এ-ঘরে বসে যা বলে গিয়েছেন, তা ডাকাতরা জানতে পারলে সব ভেস্তে যাবে। ও বলল, "কিন্তু ডাকাতরা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে ডাবুদার বাবাকে টেলিফোন করেছিল, সে-কথাটা বলে ফেলেছি।"

মা বললেন, "খুব অন্যায় করেছ। এইজন্যই তোমাদের সামনে ওসব কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু খবরদার, আর যেন একটি কথাও কাউকে বোলো না।"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "না মা, আর একটা কথাও বলব না। হনুমন্তিয়াজী আর এসেছিলেন?"

মা গম্ভীর স্বরে বললেন, "না।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল "মা, ডাবুদার বাবা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন?"

মা রীতিমতো রেগে ঝেঁজে বলে উঠলেন, "তা আমি কী করে জানব? আর তোমাকেই বা এসব কথা ভাবতে বলেছে কে? ক্লাসে বসে বসেও তুমি আজ এসবই ভেবেছ। কিন্তু তোমাকে আমি বলে দিয়েছি না, এসব কথার মধ্যে তুমি একদম থাকবে না?"

গোগোল মনে-মনে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেল আর অন্যায়টা মেনেও নিল। কিছু না বলে দুধের গেলাস নিয়ে চুমুক দিল।

মা বললেন, "তুমি আজ বাইরে যাবে না।"

কথাটা শুনেই গোগোলের মুখ থেকে দুধ চলকে পড়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে মুখের দুধটা গিলে ফেলল, কিন্তু মায়ের এই নিষেধটা শুনে ওর চোখে যেন অন্ধকার নেমে এল। একবার বেরোতে না পারলে, মহেশানিদের বন্ধ দরজার লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে দেখা হবে না! ওটা যে ইস্কুল থেকেই ভেবে এসেছে। ও করুণ মুখে বলল, "মা, আমি একটুও খেলতে যাব না?"

মা বললেন, "গেলেই তো তুমি বন্ধুদের কাছে গিয়ে সব কথা গল্প করবে।"

গোগোল কাতর স্বরে বলল, "সত্যি বলছি মা, ওসব কথা একটাও আমি কারুকে বলব না।"

মা গোগোলের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু ভাবলেন, আর আপন মনেই বললেন, "কী যে সব ঘটতে চলেছে, কে জানে। ঠিক আছে, তুমি নীচে যাবে আর ঠিক আধ ঘণ্টা খেলেই চলে আসবে।

বঙ্কিমদাকে যেন খুঁজতে পাঠাতে না হয়।"

গোগোল তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "কারোকে খুঁজতে যেতে হবে না। আমি ঠিক আধ ঘণ্টা খেলে চলে আসব।"

মা ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু দুধ না খেয়েই তুই উঠে পড়লি যে?"

গোগোল আবার অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বলল, "ওহো, ভুলেই গেছি।" বলে দুধের গেলাশ হাতে তুলে নিল।

মা বললেন, "তোমার দেখছি মাথায় কিছুই নেই। সেই-জন্যই আণ্টি খাতায় ওসব লিখেছেন।"

গোগোল মুখ নামিয়ে দুধের গেলাসে চুমুক দিল। এই অপরাধে মা যদি এখন আবার বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন, তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ও ভয়ে-ভয়ে দুধের গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। মা শোবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললেন, "মনে রেখো, ঠিক আধ ঘণ্টা, আর বন্ধুদের সঙ্গে ডাবুর বিষয় নিয়ে একটা কথাও নয়।"

গোগোল ঘাড় কাত্ করে শব্দ করল, "হুঁ।" দুধের গেলাস খালি করে টেবিলে রাখল। অন্যান্য দিন ওর মুখ দিয়ে খাবার আর দুধ গলতেই চায় না। আজ যে কেমন করে সব খেয়ে ফেলল, নিজেই জানে না। হাত দিয়ে দুধের দাগ ঠোঁট থেকে মুছে, বাইরে যাবার দরজা খুলল। বলল, "বঙ্কিমদা, দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

বলে গোগোল দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিমদা দরজাটা বন্ধ করার পরে ও লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো ফ্লোর ওপরে মহেশানিদের ফ্ল্যাট। কিন্তু লিফট এখন নীচে নামছে। ও একবার নিজেদের বন্ধ দরজার দিকে দেখল। মা যদি দেখতে পান, গোগোল এখন নীচে না গিয়ে ওপরে যাচ্ছে, তা হলে নিশ্চয়ই একটা কিছু সন্দেহ করবেন আর ওকে ঘরের মধ্যে ডেকে নেবেন। কোথাও যেতে দেবেন না।

গোগোল লিফটের সামনে আর দাঁড়াতে সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সিক্সথ ফ্লোরে উঠে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সব ফ্ল্যাটের দরজাই বন্ধ। গোগোল ঠিক ইঁদুরের মতো শব্দ না করে ছিটকে মহেশানিদের দরজার সামনে গেল। মাথা নামিয়ে ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিল। দিতেই ওর মাথার চুলগুলো যেন সব খাড়া হয়ে উঠল। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। ডাবুদা! ডাবুদা মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ভিতরে!। ভিতরে কোথায় যেন একটা জানালা খোলা রয়েছে। সেই আলোয় দেখা গেল, মহেশানিদের বসবার ঘরে ডাবুদা পাশ ফিরে বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ডাবুদাই তো? গোগোলের ইচ্ছা করল, ছোট্ট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চোখটা ঢুকিয়ে দেয়। পর্দাটা তাহলে তোলা রয়েছে? ডাবুদা কার সঙ্গে কথা বলছে? ওটা ডাবুদাই তো? গোগোল কি চিৎকার করে ডেকে উঠবে?

এই সময়েই লিফট এসে থামল, আর কাদের গলার স্বর শোনা গেল। গোগোল প্রায় লাফ দিয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল। এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, তরতর করে নামতেই লাগল। ওর গায়ে কেবল কাঁটা দিচ্ছে আর বুকের মধ্যে যেন হাজারটা ড্রাম বাজছে। ও নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি কি ওটা ডাবুদা? ডাবুদা মহেশানিদের ফ্ল্যাটের মধ্যে? যাকে নিয়ে এত বড় হুলুস্থুল কাণ্ড চলেছে, সে বসে আছে এই বিল্ডিংয়েরই একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে?

গোগোল নীচে নেমে এল। ওর বন্ধু জর্জ আর সুমিত এক সঙ্গে ওকে ডেকে উঠল। গোগোল যেন ওদের দেখেও দেখছে না। ওর চোখের সামনে ডাবুদার মুখটাই কেবল ভাসছে। ডাবুদার গায়ে কি জামা ছিল? না, সেরকম স্পষ্ট করে দেখা যায়নি।

সুমিত বলল, "কীরে গোগোল তোর মুখটা ওরকম দেখাচ্ছে কেন? বাড়িতে বকুনি খেয়েছিস?"

গোগোল নিজেই জানে না ও সুমিতের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। জর্জ ওর বড়-বড় দাঁতে হেসে বলল, "তুই কি এখনো ডাবুদার কথা ভাবছিস? তুই বুঝি জানিস না কী ঘটেছে?"

গোগোল কোন কথা বলতে পারল না, কেবল জর্জের মুখের দিকে তাকাল। সুমিত গোগোলের কাঁধে হাত দিয়ে নিচু গলায় বলল "ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা ডাবুদার বাবাকে টেলিফোন করে এক লাখ টাকা চেয়েছে, না পেলে ডাবুদাকে মেরে ফেলবে। পেলে ডাবুদাকে ছেড়ে দেবে।"

গোগোলের যেন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে এল। আশ্চর্য, এরা এসব কথা জানল কী করে? গোগোল তো কিছুই বলেনি। মা শুনলে ভাবতেন, গোগোলই হয়তো বলেছে। কিন্তু এক লাখ টাকার কথা কে বলল? হনুমন্তিয়াজী তো পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা বলেছিলেন। তবু সুমিত আর জর্জকে গোগোল কোন কথাই জিজ্ঞেস করতে পারল না। ওর চোখের সামনে এখনো ডাবুদার চেহারাই ভাসছে। ডাবুদা পাশ ফিরে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। ডাবুদাই তো? তাহলে তো আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত না, এখনই আটতলায় গিয়ে ডাবুদার বাবাকে খবরটা দিতে হয়। অন্তত গোগোল ওর মাকে খবরটা দিতে পারে।

কথাটা মনে হতেই গোগোল সুমিত আর জর্জকে অবাক করে দিয়ে লিফটের কাছে ছুটে গেল। লিফট নীচেই ছিল। ও ভিতরে ঢুকে লিফটের দুটো দরজা টেনে দিয়ে ফোর্থ ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল। লিফট উঠতে লাগল। প্রথমে মাকে বলাই স্থির করল। কিন্তু ডাবুদা যদি না হয়? ডাকাতরা চুরি করে ডাবুদাকে মহেশানিদের ফ্ল্যাটে লুকিয়ে রাখবে? তা কি সম্ভব? তা ছাড়া, ডাকাতরা যাকে চুরি করে সে কি ওরকম ভাবে বসে বসে কথা বলতে পারে?

লিফট ফোর্থ ফ্লোরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু গোগোলের মনে নতুন করে সন্দেহটা দেখা দিতেই ও সিক্সথ ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল। ডাবুদা যদি মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ভিতরে থেকেই থাকে, আর পর্দাটা তোলা থাকে, তাহলে এখনো হয়তো দেখা যেতে পারে। আর একবার ঠিক করে দেখে নেওয়াই ভাল।

লিফট সিক্সথ ফ্লোরে উঠে দাঁড়াল। গোগোল দুটো দরজা খুলে বেরিয়ে এসে, আবার দুটো দরজাই টেনে বন্ধ করে দিল। দিতেই লিফট নেমে গেল নীচে। তার মানে নীচে থেকে এখনই কেউ বোতাম টিপেছে। গোগোল দেখল, সব ফ্ল্যাটের দরজাই বন্ধ, কেউ কোথাও নেই। ও সোজা গিয়ে দাঁড়াল মহেশানিদের বন্ধ দরজার সামনে। নিচু হয়ে ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিল। কিন্তু ও কিছু দেখবার আগেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল আর ভিতরের পর্দাটা যেন জীবন্ত হয়ে ওকে একদম জড়িয়ে জাপটে টেনে নিল। দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। গোগোল চিৎকার করতে চাইল, পারল না। মনে হল একটা শক্ত হাত ওর মুখের ওপর বাঘের থাবার মতো চেপে বসল। চোখের সামনে সবই অন্ধকার। **(ক্রমশ)**

ছবি সমীর সরকার

চুনী আর প্রদীপ। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল? সেই অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে?

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৫ ॥

খেলোয়াড় জীবনের কথা লিখতে বসে আজ সেই ভয়ংকর দিনটির কথা বারবার মনে পড়ছে, যেদিন আমার জীবনের খেলাই শেষ হয়ে যেতে পারত। শুধু আমারই নয়—আমাদের দু ভাইয়ের, প্রদীপ ব্যানার্জীর এবং আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের। পরবর্তী জীবনে আমাদের সঙ্গে খেলেই এদের অনেকে ফুটবলে নাম করেছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে আমরা সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

১৯৫৩ সালের ঘটনা। আমি তখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র। প্রথম ডিভিশনে খেলার তখনো চান্স পাইনি। মোহনবাগান দলে মাঝে-মাঝে খেলছি পাওয়ার লীগে, ট্রেডস কাপে এবং দু-একটি জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায়। কলেজের হয়ে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা তো ছিলই।

কখন যে কীভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসে, কেউ বলতে পারে না। তোমরা অনেকে হয়তো ইংলণ্ডের বিখ্যাত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের দুর্ঘটনার কথা শুনেছ। ১৯৫৮ সালে মিউনিখ থেকে ফেরার পথে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের গোটা দলটাই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। জান বোধ হয়, ওই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডেরই খেলোয়াড় হচ্ছেন বিশ্ব-বিখ্যাত ববি চার্লটন। ৭৬-এ ব্রুক টাউন ক্লাবের সঙ্গে ও'রই কলকাতায় খেলতে আসার কথা ছিল। তবে আসতে পারেননি। মিউনিখ দুর্ঘটনার ধ্বংসস্তূপ থেকে আধমরা যে দু-চারজন খেলোয়াড়কে টেনে বার করা হয়েছিল, তাঁদেরই একজন ওই ববি চার্লটন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়দের মত আমরাও হয়তো শেষ হয়ে যেতাম, যদি খেলোয়াড়-ভরতি বাসখানি ষাট-সত্তর ফুট নিচু খাদের মধ্যে পড়ার মুখে অদ্ভুতভাবে পাথরের বিরাট চাঁইয়ে ধাক্কা খেয়ে আটকে না যেত। আমরা সবাই শিউরে উঠেছিলাম।

দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল বিহারে, রাঁচি-মুরি রাস্তার পাশে। আমরা খেলতে গিয়েছিলাম রাঁচিতে গভর্নর'স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়, বেহালার একটি ক্লাব রামকৃষ্ণ স্পোর্টিংয়ের পক্ষে। পি কে ব্যানার্জী তখন জামসেদপুরের উঠতি খেলোয়াড়। জামসেদপুর থেকে ও'রাও এসেছিলেন ওই প্রতিযোগিতায় আমাদের বিরুদ্ধে খেলতে। খেলার পর দুই দলের খেলোয়াড় এক বাসে বোঝাই হয়ে ট্রেন ধরতে ছুটছিলাম মুরিতে। হাতে সময় বেশি ছিল না। তাই আবছা অন্ধকারেও ড্রাইভার বাস চালাচ্ছিলেন ফুল স্পীডে। সম্ভবত উল্টো দিক থেকে আসা আর-একখানি বাসের জোরালো হেডলাইটে ড্রাইভারের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে থাকবে। তিনি বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। বাস ছুটতে আরম্ভ করল খাদের দিকে। আমরা প্রথমে অবস্থাটা বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পেরেছি এবং ইষ্টনাম জপ করছি, তখন প্রচণ্ড এক ধাক্কা। পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা খেয়ে বাসখানি কাত হয়ে থেমে গেল। ভাগ্যিস ড্রাইভার স্পীড কমাতে পেরেছিলেন। না হলে ওই ধাক্কায় সব চুরমার হয়ে তালগোল পাকিয়ে যেত। কিংবা ষাট সত্তর ফুট নীচে পড়ে গেলে আমাদের হাড়মাংস ও বাসের কিছু যন্ত্রাংশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না।

ওই কাত হওয়া বাসকেই কিন্তু আমরা সবাই মিলে ঠেলে-ঠুলে দাঁড় করিয়ে ওই বাসে চড়েই মুরিতে এসে ট্রেন ধরেছিলাম। অবশ্য ট্রেন একটু লেট ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। বাসে অনেক খেলোয়াড়ই ছিল। পি কে ব্যানার্জীর কথা আগেই বলেছি। আর যারা ছিল তাদের মধ্যে পরে ফুটবলে নাম করেছে এস ঘোষ, পি চ্যাটার্জী, এ ব্যানার্জী, এস সেন, এস দত্ত প্রভৃতি। পি চ্যাটার্জী খেলত ই বি আর দলে, এ ব্যানার্জী কালীঘাট ক্লাবে। ওর ডাকনাম ছিল বিড়লা। এস সেন ও এস দত্ত আমার সঙ্গেই মোহনবাগানে খেলেছে। এস সেনের ডাকনাম বিচ্ছু, এস দত্তর কেষ্ট। ফুটবলের দর্শকদের কাছে সবাই পরিচিত।

যে দু-চারজন খেলোয়াড় প্রথম ডিভিশনের কোন ম্যাচ খেলার আগেই আই এফ এ দলে খেলেছেন, আমি তাঁদেরই একজন, এবং তাঁদেরই মতো ভাগ্যবান। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি দ্বিতীয় ডিভিশনের এক অসাধারণ খেলোয়াড় আর লামসডেন ১৯৩৮ সালে আই এফ এ দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। লামসডেন খেলতেন রেঞ্জার্স ক্লাবে। তখন দ্বিতীয় ডিভিশনের টিম। আমি মোহনবাগান ছাড়া আর কোন ক্লাবে খেলিনি। সুতরাং দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার প্রশ্ন ওঠে না। মোহনবাগানে লীগের খেলা শুরু করি ১৯৫৪ সালে। তার এক বছর আগেই কিন্তু আই এফ এ দলে নির্বাচিত হয়েছিলাম। অবশ্য প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য। ওই রাঁচিতেই, এবং আগে যে গভর্নর'স কাপে খেলার কথা বলেছি, সেই খেলারই সুবাদে।

আমার খেলা দেখে গভর্নর'স কাপের ব্যবস্থাপকরা এত খুশি হয়েছিলেন যে, আমাকে 'বালকবীর' করে তুলেছিলেন। সাইকেল রিকশায় চড়িয়ে সারা শহর ঘুরিয়েছিলেন। মুখে চোঙ লাগিয়ে বলে বেরিয়েছিলেন—"এই সেই কলকাতা ফুটবলের বিস্ময়-বালক চুনী গোস্বামী। আজ আবার খেলবে।" আমার আনন্দও হচ্ছিল, আবার লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশেও যাচ্ছিলাম। ওসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করার মত মনোবল তখনো তো গড়ে ওঠেনি।

গভর্নর'স কাপের খেলার বেশ কিছুদিন পরে রাঁচিতে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন হল। খেলা আই এফ এ একাদশের সঙ্গে বিহার দলের। রাঁচির ব্যবস্থাপকরা কলকাতায় এসে আই এফ এ কর্তৃপক্ষকে বললেন, দলে যেন চুনী গোস্বামীকে রাখা হয়।

শুনে আই এফ এ-র কর্তারা তো হতভম্ব। বললেন, "সে কী! চুনী তো এখনো লীগ ম্যাচই খেলেনি। তাকে দলে নেব কীভাবে?"

"এখানে না খেলুক, ওখানে সে মাতিয়ে দিয়ে এসেছে। তাকে দলে রাখলে টিকিট বেশি বিক্রি হবে। তাকে দলে রাখতেই হবে।" কিছুটা আবদারের সুরেই বলেছিলেন রাঁচির লোকেরা।

এই কথাবার্তার খবর আমি শুনেছিলাম মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুতে, সেদিন সন্ধ্যায়। এবং শুনেছিলাম আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। কাল কাগজে নাম বেরোবে। দারুণ উত্তেজনা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম। বারবার মনের কোণে সন্দেহ উঁকি মারছিল। সত্যিই কি আমাকে দলে নেওয়া হয়েছে? রাতে ভাল

আমি এখন ছোট...

আমিও তো বড় হবো

বড় হ'য়ে বইটই প'ড়ে, লেখাপড়া শিখে আমিও বাবার মত কাজকর্ম করবো। আমার বাবাও তো ছোটবেলা থেকে তাই করেছে···আজ আমাদের বাড়ি···গাড়ি। দিদির মত আমিও কলেজে পড়বো। তারপর দিদির বিয়ে। সে কী মজা, কত হইচই। তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারছি না।

আপনার ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, নিজেদের অবসর-জীবনের সংস্থান··· এ সব কিছুরই ব্যবস্থা করার মত নতুন নতুন সঞ্চয় প্রকল্প আজ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালন অনেক সহজ করেছে। আমাদের 'ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট' এই রকমই একটি সঞ্চয় প্রকল্প।

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট প্রকল্প

★ মাসে ৫০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ২০,৯০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲।

★ মাসে ১০০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ৪১,৮০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৭৬,৬০০৲।

এছাড়া এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

অথবা যে কোন শাখা অফিস।

চেয়ারম্যান ঃ শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB-32/77

ঘুম হল না। খুব ভোরে বিছানা থেকে উঠে ছুটলাম গড়িয়াহাটার মোড়ে, একখানা আনন্দবাজার পত্রিকা খুঁজতে। হকারের কাছ থেকে কাগজ কিনেই খেলার পাতাটা খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম। তখনো সন্দেহ হচ্ছে। নাম আছে তো? দেখি আই এফ এ-র নির্বাচিত দলে শেষ নামটি আমারই—পনেরো জনের দলে পঞ্চদশ স্থানে। একবার ভাবলাম, আবার বাদ দিয়ে দেবে না তো?

জীবনে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি, বহু সম্মান পেয়েছি। কিন্তু সেদিন শুধু নাম দেখেই হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলাম। দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রথম ডিভিশন লীগে মোহনবাগানে আমার প্রথম ম্যাচ খেলার দিনটি আমার জীবনের আর-এক স্মরণীয় দিন। ডায়েরি খুলে দেখছি, তারিখটি ছিল ১৯৫৪ সালের ২৯ মে। শনিবার। সেদিন আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন সফল হয়েছিল। খেলা ছিল ইস্টার্ন রেল দলের সঙ্গে। ওই খেলায় যেভাবে আমি দলভুক্ত হয়েছিলাম সেও এক মজার গল্প।

আগে থেকে আমাকে দলে রাখা হয়নি। হবেই বা কেন? মোহনবাগানে সে বছর চারজন ইনম্যান। চারজনই নামী খেলোয়াড়। সত্তার, রুনু গুহঠাকুরতা, বদ্রু ব্যানার্জী ও রবীন পাত্র। বদ্রুর ভাল নাম তোমরা অনেকেই জান। সমর ব্যানার্জী। পরে ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে ও'রই অধিনায়কত্বে ভারত ফুটবলে পেয়েছিল চতুর্থ স্থান। সত্তার এবং রুনু গুহঠাকুরতা তো আগে থেকেই অলিম্পিকের ছাপমারা খেলোয়াড়। রবীন ওই বছরই হাওড়া ইউনিয়ন থেকে এসেছিল মোহনবাগানে। বেশ ভাল খেলত। ইনম্যান হিসাবে আমিই জুনিয়র এবং পর্যায়ক্রমে পঞ্চম। সুতরাং ধরেই নিয়েছিলাম, ওই বছরও হয়তো প্রথম ডিভিশনে খেলার চান্স পাব না। তখন খেলোয়াড় বদলেরও নিয়ম ছিল না যে, পরিবর্ত হিসাবে খেলব।

মরসুমটা মোহনবাগানের পক্ষে পরে শুভ হলেও সূচনাটা ছিল সন্দেহজনক। লীগের প্রথম চারটি খেলার মধ্যে তিনটি খেলাই ড্র করে বসেছিল। জিতেছিল একটিতে। দুপুরের পর বাড়িতে বসে বাবা ও কাকার সঙ্গে আমি ও দাদা ওই কথাই আলোচনা করছিলাম। আগেই বলেছি, সেদিন ছিল শনিবার। বাবা ও কাকা সকাল-সকাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সবাই মিলে মোহনবাগান-ইস্টার্ন রেলের খেলা দেখতে যাব বলে। ইস্টার্ন রেল তখন খুবই শক্তিশালী দল। বাবা বলছিলেন, "আজ আর একটি পয়েন্ট যাবে।" কাকা বললেন, "দুটিও যেতে পারে।" আমি ও দাদা পাঁপর ও মুড়ি খাচ্ছিলাম, তখনও জানি না যে, খেলতে হবে। না হলে খেলার আগে কেউ মুড়ি-পাঁপর খায়?

হঠাৎ দেখি একখানা মোটর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে থেমেই জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে। বলাইদা ছাড়া আমাদের বাড়িতে তখন কেউ মোটরে আসত কালেভদ্রে। ভাল করে চেয়ে দেখি, কুমারবাবুর পরিচিত অস্টিন গাড়িখানা। মন্মথদা শশব্যস্তভাবে গাড়ি থেকে নামছেন। বললেন, "চুনী, শিগগির ওঠ্ গাড়িতে। এখনই যেতে হবে। কুমারবাবু বলেছেন, আজ তোকে খেলতে হবে।"

প্রথমটায় মনে হল যেন দৈববাণী শুনছি। অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড় কুমারবাবু। তখন মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। তিনি গাড়ি পাঠিয়েছেন। মন্মথদা আমাকে নিতে এসেছেন। স্বর্গত মন্মথ ঘোষ তখন ছিলেন ক্লাবের কর্মী এবং খেলোয়াড়দের পরম বন্ধু। ক্লাবের ব্যাপারে তাঁর কথারও দাম ছিল। ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খেলা। আমি ছাড়া রয়েছেন চারজন নামী ইনম্যান। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বললাম, "ব্যাপার কী বলুন তো মন্মথদা?"

"গাড়িতেই সব বলব। তাড়াতাড়ি ওঠ। দেরি করছিস

মোহনবাগান, ১৯৫৪ সাল। দাঁড়িয়ে, একদম বাঁয়ে, কিশোর চুনী

কেন?" ধমকের সুরে বললেন মন্মথদা।

বাবা ও কাকা বললেন, "আমরা পরে যাব, তোরা গাড়িতে ওঠ।" আমি ও দাদা গাড়িতে উঠলাম। যাত্রার সময় দেখি, মা'ও চেয়ে আছেন গাড়ির দিকে। মনে হল যাত্রা শুভ।

গাড়িতে বসেই মন্মথদা বললেন, "বদ্রুর এক আত্মীয় মারা গেছেন। খেলতে পারবে কিনা ঠিক নেই। রুনুর পোর্ট-কমিশনার্সের চাকরিতে কাল নাইট ডিউটি ছিল। শরীর ভাল নেই। জানিয়ে দিয়েছে খেলতে পারবে না। সত্তার নতুন চাকরি পেয়েছে বার্ড কোম্পানিতে। আজ তাকে মিলে যেতেই হবে। সেও অনিশ্চিত। তাই রবীন পাত্রকে খবর দেওয়া হয়েছে। রবীন খেলবে লেফট ইনে। বদ্রু যদি না আসে তুই রাইট ইনে খেলবি।"

আবার যেন দৈববাণী। আমি চুপ করে আছি। গাড়ি ছুটছে হুহু করে। মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। খেলতে পাব তো? যদি খেলতে পাই ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে কেমন খেলব? বদ্রু ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত এসে পড়বেন না তো? মনে এই ধরনের নানা চিন্তা, নানা ভাবনা।

খেলা ছিল ক্যালকাটা মাঠে, এখন যেটা মোহনবাগান মাঠ। আমরা ড্রেস করে যাব মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠ থেকে, এখন যেটা ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠ। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, তাঁবুর সামনে বেশ জটলা। বলাইদা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, "আগে চট করে জার্সিটা পরে নিবি।"

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখি, মান্নাদা (শৈলেন মান্না), সুশীলদা (সুশীল গুহ), রতন সেন, ভেঙ্কটেশ, কেষ্ট পাল, কেষ্ট দত্ত সবাই ড্রেস করছে। বদ্রু, রুনু, সত্তার নেই। চোখ খুঁজছিল বদ্রুকেই। মন বলছিল, যেন না আসেন। ড্রেসিং রুমের জানালা দিয়ে হাতের ইশারায় বলাইদা আবার আমাকে জার্সি পরে নিতে ইঙ্গিত করলেন। আমি দেখলাম, সবাই আগে পরছে মোজা ও বুট। রবীন পাত্রেরও খালি গা। আগে মোজা অ্যাঙ্কলেট পরছে। বলাইদা কেন যে আমাকে আগে জার্সি পরতে বারবার বলছেন, বুঝতে পারলাম না। তবু তাঁর কথায় হাতের কাছে যে জার্সিটা পেলাম টেনে নিয়ে পরে ফেললাম। তাঁর কথা কোনদিন অমান্য করিনি। তখন জার্সিতে কোন নম্বর থাকত না। হঠাৎ বাইরে একটা সোরগোল উঠল। বেশ জোর আনন্দধ্বনি এবং হাতে হাতে তালি। কী? না, বদ্রু ব্যানার্জী এসে গেছেন। আমি একেবারে ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেলাম। আমার তখন এক পায়ে বুট পরা হয়ে গেছে। অন্য পায়ে আর বুট পরতে পারছি না। আমি তাকাচ্ছি রবীনের দিকে, রবীন আমার দিকে। ধরেই নিয়েছিলাম বদ্রু খেলবেন রাইট ইনে, রবীন লেফ্‌ট ইনে। কারণ রবীন অভিজ্ঞ এবং লেফ্‌ট ইনেরই খেলোয়াড়। আমার জার্সি পরাই বৃথা হবে। রবীনের তখনো কিন্তু খালি গা, পায়ে বুট। হাবভাবে বুঝলাম বেশির ভাগ খেলোয়াড় আমাকেই বাদ দেবার পক্ষে।

এমন সময় কুমারবাবু আস্তে-আস্তে ঢুকলেন ড্রেসিং রুমে। তাঁর সঙ্গে বলাইদাও। কুমারবাবু খেলোয়াড়দের একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, লেফ্‌ট ইনে খেলতে পারবে? যদি না পারো তো রবীন খেলবে লেফ্‌ট ইনে। রাইট ইন বদ্রু তো এসেই গেছে। আমি তখন খেলতাম রাইট ইনে। বলাইদা দূর থেকে আমাকে ইশারা করে কুমারবাবুর কথায় সায় দিতে বলছেন। অর্থাৎ বলছেন লেফ্‌ট ইনে খেলতে রাজি হতে। আমি তো একপায়ে খাড়া হয়েই ছিলাম। কুমারবাবুকে বললাম, লেফ্‌ট ইনে খেলতে পারব। "ভাল করে খেলো," বলেই কুমার-বাবু ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেচারা রবীনের আর সেদিন জার্সি পরা হল না।

কেন বলাইদা আমাকে প্রথমে জার্সিটা গায়ে চাপাতে বলে-ছিলেন জানো? সংস্কারই বলো আর কুসংস্কারই বলো, মোহন-বাগানের কোন খেলোয়াড় একবার জার্সি পরে ফেললে সেই খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেবার রেওয়াজ ছিল না। বিশেষ করে কুমারবাবু এই নিয়মটা মেনে চলতেন। তখন খেলোয়াড় বদলেরও নিয়ম ছিল না, সে-কথা আগেই বলেছি। বোধহয় সেদিন খেলতেও পেয়েছিলাম বলাইদার পরামর্শে আগে জার্সিটা গায়ে দেওয়ায়।

কিন্তু আমাকে কী মানসিক চাপের মধ্যে প্রথম ম্যাচ খেলতে হয়েছিল, বুঝতেই পারছ। ক্যালকাটা মাঠেও ওই আমার প্রথম

খেলা। যখন মাঠকে প্রণাম জানিয়ে খেলতে নামি, তখন মনে পড়ছিল ওই মাঠে প্রথম ঢোকার কথা। সেটা ছ'বছর আগের ঘটনা। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় দলের লন্ডন অলিম্পিক যাত্রার আগে একটা খেলা হয়েছিল অলিম্পিকের পসিব্‌ল ও প্রোবাবলস দলের মধ্যে। পসিব্‌ল ও প্রোবাব্‌ল্‌স কথার মানে জানো তো? প্রায় একই মানে, সম্ভাব্য। তবে প্রোবাবলস-এর জোর বেশি। ব্যাপারটা হল, যাদের মধ্য থেকে অলিম্পিক দল গড়া হবে, তাদের দুটি ভাগে ভাগ করে খেলানো। ওই খেলা দেখার জন্য আমি ও দাদা দাঁড়িয়ে ছিলাম ক্যালকাটা মাঠের দক্ষিণদিকের র‍্যামপার্টে। খেলার আগে বলাইদা মাঠের এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই হাতের ইশারায় 'সি' গেটে চলে আসতে বললেন। 'সি' গেট ছিল খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের মাঠে ঢোকার ভি আই পি গেট। আমরা ওই গেটের কাছে এসে দাঁড়ালে বলাইদা দূর থেকে আমাদের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে পঙ্কজ গুপ্তকে বললেন, "ওই দুটি ছেলেকে আমি খেলা শেখাই। দেখবেন, ওরা একদিন এই মাঠে খেলবে। ওদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিন।" একখানা চিরকুটে তখনই পঙ্কজ গুপ্ত সবুজ কালিতে লিখে দিলেন "অ্যাডমিট টু"। তিনি নীল বা কালো কালি কখনো ব্যবহার করতেন না। চিরদিন ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লিখে গেছেন। খেলার জগতের দিকপাল বিরাট হৃদয়ের মানুষ পঙ্কজ গুপ্তকে সেই আমরা প্রথম দেখলাম এবং প্রথম ক্যালকাটা মাঠের সাদা গ্যালারিতে মহা আরামে বসে দেখলাম ভারতের ডাকসাইটে সব খেলোয়াড়ের খেলা।

মোহনবাগানের হয়ে ক্যালকাটা মাঠে আমার প্রথম লীগ ম্যাচ খেলার দিন বলাইদার সেই কথাই মনে ছিল, "ওরা একদিন এই মাঠে খেলবে।" সুতরাং মনের ওপর চাপ থাকলেও ভাল খেলার জন্য আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী। না হলে কি নারায়ণকে উৎসর্গ করা তুলসী পাতা পকেটে রেখে খেলি? আমার প্রথম খেলার সাফল্য হয়তো ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিল। খেলা আরম্ভ হওয়ার পর আট মিনিটের সময় আমারই গোলে মোহনবাগান ১—০ এগিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান জিতেছিল ৩—০ গোলে। আমি গোলটি করেছিলাম বদ্রু ব্যানার্জির কাছ থেকে বল পেয়ে একটি সুন্দর ভলি কিকে।

পরের দিন অনেক কাগজে আমার ওই প্রথম গোলটিকে একটি বাহারী গোল বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। আমার খেলারও প্রশংসা ছিল সব কাগজে। কী লেখা হয়েছিল বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলছি, লীগের প্রথম খেলাটি আমার খেলোয়াড় জীবনের দীর্ঘ পথ মসৃণ ও প্রশস্ত করে তুলেছিল।

ওই ম্যাচে দুই দলে যারা খেলেছিল, তাদের নাম জানাচ্ছি, তখনকার দল সম্পর্কে একটা আন্দাজ দেবার জন্য।

মোহনবাগানে ছিল—এস চ্যাটার্জী, সুশীল গুহ ও শৈলেন মান্না ; রতন সেন, সুভাষ সর্বাধিকারী ও শম্ভু ঘোষ ; ভেঙ্কটেশ, সমর ব্যানার্জী, কেষ্ট পাল, চুনী গোস্বামী ও কেষ্ট দত্ত।

ইস্টার্ন রেল দলে খেলেছিল—অনিল চৌধুরী; অজিত গড়গড়ি ও অনিল নাগ ; বি চৌধুরী, পি বসু ও নিখিল নন্দী ; সরোজ ঘোষ, কে ব্যানার্জী, মেওয়ালাল, ডি গোস্বামী ও এস চৌধুরী।

খেলার রেফারি ছিলেন প্রতুল চক্রবর্তী।

তোমরা যারা আমার এই লেখা পড়ছ , হয়তো লক্ষ করছ, অনেক ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান। ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই খেলাতেই। যেমন প্রথম বলে উইকেট, ইনিংসের প্রথম বলে ক্যাচ, প্রথম ম্যাচে ভাল রান, প্রথম খেলায় গোল, প্রথম ম্যাচে জয়, প্রথম বছরে লীগ ও শীল্ড। হ্যাঁ, ওই ১৯৫৪ সালেই আমরা লীগ ও শীল্ড জিতেছিলাম। এমন আরও অনেক রেকর্ড আছে। আস্তে আস্তে সবই লিখব। ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে লীগে প্রথম গোলটি করার পর গ্যালারি থেকে যে বিশাল আনন্দের আওয়াজ উঠেছিল, আজ লিখতে লিখতে যেন সেটা আবার কানে শুনছি। যেন ফিরে যাচ্ছি হারানো দিনের মধ্যে। বয়সে আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম। তার উপর প্রথম খেলা। গোলের পর তাই সবাই আমাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়েছিলেন। আনন্দে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম বলাইদার সোনা-দাঁতের মিষ্টি হাসি দেখে। তিনি বোধহয় আমার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিলেন।

আর-একজন শুভানু ধ্যায়ীর কথাও আজ আমার মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন মোহনবাগান ক্লাবের সুবিখ্যাত দাদু। নাম ছিল শচীন বসু। অনেকেই সে-নাম জানত না। ছেলেবুড়ো সবাই দাদু বলে ডাকত। মারা গেছেন বোধ হয় একাশি কি বিরাশি বছর বয়সে। মোহনবাগান ছিল তাঁর প্রাণ। ফুটবল মাঠে নিত্যদিনের যাত্রী। মধ্য-কলকাতার বনেদী বাড়ির সন্তান।ও'রই ঠাকুর্দা ডঃ জগবন্ধু বসুর নামে রাস্তার নাম। আশি বছর বয়সেও খেলা দেখার পর ইডেন গার্ডেন ঘিরে চার পাঁচ পাক হেঁটে বেড়াতেন। ভারি মজার মানুষ ছিলেন। কত মজার গল্প শুনেছি তাঁর কাছে। একবার ক্লাবের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে বহুরূপী প্রতিযোগিতায় লাল কস্তাপাড় শাড়ি, আর হাতে শাঁখা এবং নাকে নথ পরে গিন্নি সেজে এসে সকলকে কী হাসিটাই না হাসিয়েছিলেন। হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বাড়িতে যেমন ঠাকুমা ছিলেন, তেমন ক্লাবেও পেয়ে গিয়েছিলাম স্নেহশীল এক দাদুকে। একদিন আমাকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। সেদিন আমার বি এসসি পাশ করার খবর জেনেছিলেন তিনি।

দাদুর মুখের বুলি ছিল, "একটি গোল, দুটি পয়েন্ট।" বলতেন, বেশি গোল দিয়ে কী হবে? এক গোলেও দু' পয়েন্ট, দুই তিন গোলেও দু' পয়েন্ট। এক গোলেও জয়, দুই তিন গোলেও জয়। খেলাতে নামার আগে বলতেন, চুনী, বেশি চাই না, শুধু একটি গোল।

এক ব্যাপারে দাদু ছিলেন একটু একচোখো। মোহনবাগানের সবই ছিল তাঁর কাছে ভাল, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সবই তাঁর কাছে খারাপ। কেউ যদি তাঁকে বলত, দাদু, চুনী তো বাঙাল, তো তিনি রেগে যেতেন। বলতেন, "হ্যাঁ, তুমি তো চুনীকে পদ্মাপার থেকে কুড়িয়ে এনেছ! তুমি এসেছ কোথা থেকে কে জানে!"

কত কথাই যে একে একে মনে পড়ছে।

(ক্রমশ)

শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলায়

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলার দেশ বীরভূম। সারা বছর ছোট, বড় কত রকমেরই না মেলা বসে এখানে। বিশেষ করে শীতের ফসল ঘরে এলে গ্রামের মানুষের হাতে যখন জমা হয় বেশ কিছু অবসর, তখনই একের পর এক এখানে শুরু হয়ে যায় মেলা আর উৎসব। যেমন তার বৈচিত্র্য, তেমনই তার রকমারি আমোদ-প্রমোদের ঢঙ্গ। বীরভূমে পৌষ সংক্রান্তিতে অজয়তীরে কেঁদুলি গ্রামে কবি জয়দেবের স্মৃতিতে যেমন বসে বাউল মেলা, তেমনই আবার অন্য আর-সব মেলার ধুম ফুরোতে না ফুরোতেই কোন এক প্রান্তে জমে ওঠে ব্রহ্মদৈত্যির মেলা। কোথাও আবার লৌকিক ধর্মরাজের পুজো উপলক্ষে বেজে ওঠে উৎসব আর মেলার বাজনা। নানা দেশের নানা প্রান্তের হাজার হাজার মানুষের সহজ সাবলীল মেলামেশার উদার আঙিনা এই সব মেলা। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের মেলা আবার এসবের মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছে। ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার দিন। দীক্ষার পবিত্র দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে এবং সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের বিকাশের জন্য তিনিই পৌষ মেলার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মেলার সূচনা হয়েছিল বাংলা ১৭৬৭ সালের ৭ই পৌষ কলকাতার কাছেই পলতার ওপারে গোরিটির বাগানে। তখনও শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়নি। ১৮৬৩ সালে বোলপুরে আজকের শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। শান্তিনিকেতনে ১৮৯১ সালে যে পৌষ উৎসবের সূচনা হয়েছিল, তা-ই পরে ১৮৯৫ সালে মেলায় রূপান্তরিত হয়।

প্রতিবারের মত এবারও তিনদিনের মেলা ছিল জমজমাট। উপাসনা, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, সাংবৎসরিক উৎসব এবং পাঠ-ভবন ও শিক্ষাসত্রের নিদর্শনপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বেদগান, সংকল্পবচন, দীপ সমর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ, রবীন্দ্ররচনা থেকে পাঠ, সংগীত, শান্তিবচন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা, পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর, খ্রীস্টোৎসব প্রভৃতি চমৎকার সব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলাপ্রাঙ্গণে বাউলগান, কবির লড়াই, পটুয়াসঙ্গীত, যাত্রা, সাঁওতালদের খেলাধুলো এবং সর্বোপরি মেলার দোকানপাটে কেনাবেচার আসর ছিল রীতিমত চিত্তাকর্ষক। মেলায় ছিল নানা রকমের প্রদর্শনী আর রবীন্দ্রনাথের বই ও শ্রীনিকেতনের রকমারি সব হস্তশিল্পের নমুনা।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে গিয়ে দোকানীরাও দেখলাম কবিতা-প্রেমিক হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ, এমনকী, কবি। একটি দোকানের পোস্টার চোখে পড়ল—

'আনতে বাগে
বাবরি জুলফি—হিপি মড
যশোর চিরুনি
ও গড্'।

উৎকৃষ্ট কবিতা না হলেও মজার বই কী। মজা ছিল দোকানের নামেও। একটি কফি ও স্ন্যাকসের স্টলের নাম হয়েছিল—টাপ্পিটোপ্পা। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রেস্তোরাঁরও নামকরণ করা হয়েছিল সেঁজুতি, বৈতালিক—এই-সব। একটি চীনে খাবারেরও দোকান হয়েছিল। মাদ্রাজী খাবারে

মেলার মাঠে ছোট্ট বাউল

ইদানীং বাঙালী শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধেরও জিভে জল আসে। মাদ্রাজী খাবারের অভাব ছিল না মেলায়। অভাব ছিল না ল্যাংচা মিঠাই মোগলাই পরোটার। কালোর হোটেল ও রেস্তোরাঁয় গ্রাম ও শহরের মানুষ পাশাপাশি বসে পেট পুরে মাছভাত খেয়েছেন। এখানেই বসত সকালে-সন্ধ্যায় জমাট আড্ডার আসর। পুরনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা এখানে এসে মিলিত হতেন। এখানেই নাম-না-জানা মানুষের পাশাপাশি বসে উষ্ণ আড্ডায় আসর সরগরম করেছেন উপাচার্য থেকে শুরু করে বিচারপতি, উচ্চপদস্থ অফিসার, ডাকসাইটে সাহিত্যিক, সম্পাদক এবং এরকম আরও অনেক মানুষ।

দরিয়াপুরের ঢোকরা সমবায় সমিতি এনেছিলেন তাঁদের হাতের কাজ। বাঁকুড়া দুমকা থেকেও চাল মাপা পাই, লোহা পেতল মেশানো ধাতুর তৈরি ঘোড়া, হাতি, ঘুঙুর, নূপুর, গয়ার গলার জং ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন গ্রামের ঢোকরারা।

সার্কাস, সাঁওতালদের তীর ছোঁড়া, নাচ ও অন্যান্য খেলা-ধুলোও তাদের কম আনন্দ দেয়নি। সাঁওতালরা এই মেলায় দল বেঁধে এসেছিলেন। কেউ কেউ আবার রণ-পায়ে চেপে এসে-ছিলেন। শিশুরা অনেকে রণ-পা সেই প্রথম দেখল। তাদের কাছে রণ-পায়ে-চাপা মানুষ ছিল পরম বিস্ময়ের বস্তু। ৮ পৌষ আতসবাজি পোড়ানোর রাত্রেও তাদের মধ্যে দেখেছি বিস্ময়, আনন্দ আর উত্তেজনা। ভাবতে ভাল লাগে যে, সুরুল গ্রামের এক মালাকার, আর কিছু নয়, শুধু রকমারি আতসবাজি তৈরির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে জীবনের পরম আনন্দ!

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
এ তো একটা বিরাট স্কুইড মাছ!

ক্ল্যাকাও ডাকছেন!

ক্ল্যাকাও আমার সঙ্গে কথা বলতে চান!
মাছের সঙ্গে কথা?

ক্ল্যাকাও মাছ নন, তিনি দেবতা!

ক্ল্যাকাওদেব, আমি এসেছি!

বলুন!

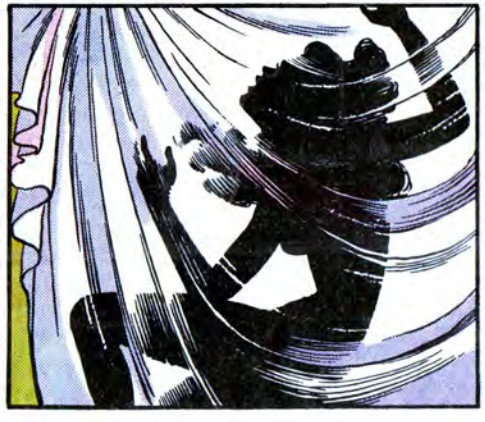

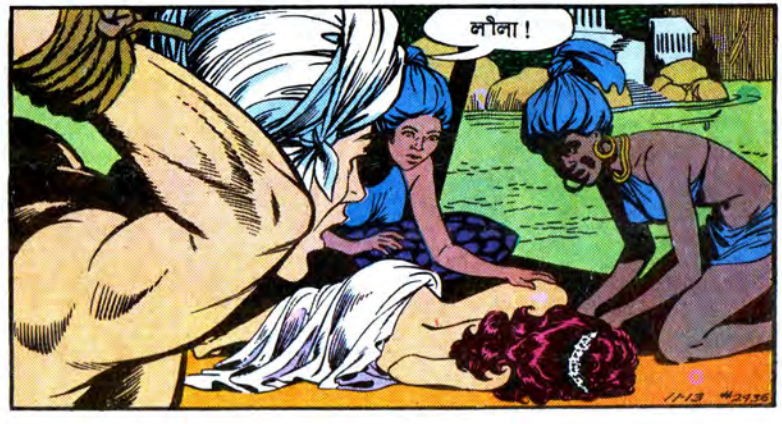
লীলা!

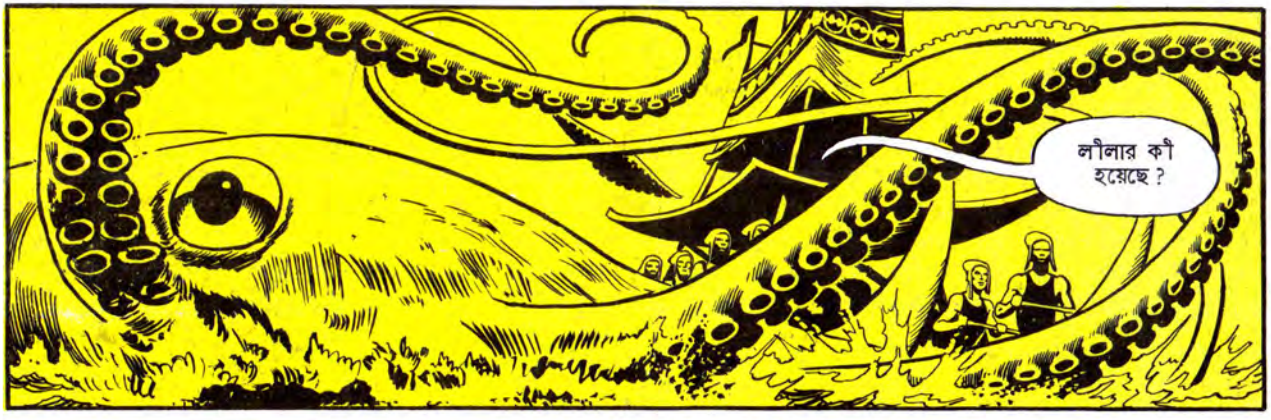

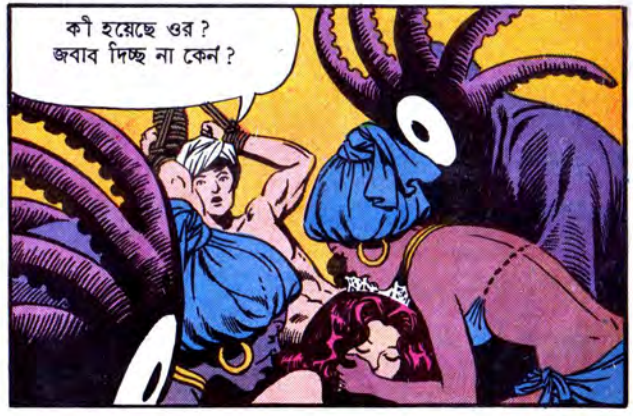

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

দুর্ঘটনা

আমার বন্ধু ঈপ্সিতা। ও লরেটো কনভেন্টে ক্লাস এইটে পড়ে। ঈপ্সিতার সঙ্গে আমার একবার আড়ি হয়েছিল। আমরা আড়ি করে বেশিদিন থাকতে পারতাম না, বড়জোর এক সপ্তাহ। সেবারেও ঠিক এক সপ্তাহ কথা বন্ধ ছিল, মানে আড়ি ছিল। তারপরে থাকতে না পেরে আমি ওকে একটা আস্ত ক্যাডবেরি ঘুষ দিয়েছিলাম, ও আমাকে অনেক স্ট্যাম্প দিয়েছিল, তারপরে আবার আমাদের ভাব হয়। আমার মায়ের সঙ্গে ঈপ্সিতার মায়েরও বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের বাড়ির ভালমন্দ খাবার ওদের বাড়ি যেত, আবার ওদের বাড়ি থেকেও খাবার জিনিস আসত আমাদের বাড়ি। আমরা ওদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকতাম। ভাব হবার দু'একদিন পরে আমি ওকে বলেছিলাম, "মাসিমাকে বলবি, আমরা সবাই মিলে পিকনিক করতে যাব।"

মাসটা ছিল ডিসেম্বর। সবাই রাজি হল পিকনিক করতে। তারপর একদিন সকালে আমরা সকলে ডায়মন্ডহারবার রওনা হলাম। আমাদের গাড়িতে ছিল ঈপ্সিতা, ওর খুড়তুতো বোন ইরানী ও ওদের ছোট পিসি। ঈপ্সিতাদের গাড়িতে ছিল ঈপ্সিতার বাবা, মা, কাকা, কাকীমা আর আমার বাবা, মা।

শীতকালের আকাশ, রোদ ঝলমল করছিল। পাখিগুলো মিষ্টি সুরে ডাকাডাকি করছিল।

গাড়ির আওয়াজ শুনে একটা খরগোশ লাল চোখ তুলে আমাদের দেখল। সকাল সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলাম। ওখানে দেখেশুনে একটা গাছের নীচে বসে আমরা গল্প করতে লাগলাম। আমার ভাই একা একা বল খেলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে খাবার ডাক পড়ল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমরা গল্পগুজব করতে লাগলাম। সারাদিন খুব মজা করে বিকেলে ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটল। উলটো দিকের একটা গাড়ির আওয়াজ শুনলাম। তারপর সব অন্ধকার...কিছু মনে নেই। জ্ঞান হলে দেখলাম, হাসপাতালে শুয়ে আছি। পরে বাবা বললেন, আমাদের গাড়ির সঙ্গে আর একটা গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল। আঘাত খুব একটা গুরুতর হল না, কয়েক-দিনের মধ্যেই আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম।

দেবযানী বাগচী (বয়স—১৩)

সেই লোকটা

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার উলটো দিকের ফুটপাথে একটা লোক জুতো সেলাই করত। প্রতিদিনই সে বসত। একটা ভাঙা চশমা তার নাকের ওপর ঝুলে থাকত। একমনে সে নীচের দিকে চেয়ে জুতো সেলাই করত। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। রোজ যখন বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যেতাম তখন দেখতাম, লোকটা তার ছোট কাঠের বাক্স আর একটা ঝোলা দুপাশে নামিয়ে রেখে একটা ছোট্ট ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে আড়চোখে তাকাত। মনে হত, ওর ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ও যেন মিটিমিটি হাসছে।

একদিন স্কুলে যাওয়ার কিছু আগে আমার ছেঁড়া জুতোজোড়া সেলাই করার কথা ভাবছি। এমন সময় দেখি সেই লোকটা এসে বসল। আমি ওর কাছেই গেলাম জুতো সেলাই করানোর জন্যে। এভাবেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। এর পর প্রায়ই আমি তার কাছে যেতাম। তার জুতো সেলাই করা দেখতাম। তার বাড়ির গল্প শুনতাম। একদিন সে আমাকে তার অল্প আয় থেকে লজেন্সও কিনে দিয়েছিল।

তাকে বহুকাল আর দেখি না, কিন্তু তার কথা আজও আমার মনে পড়ে।

কলিম আহমেদ মজুমদার (বয়স—১২)

ডোবিনা

আমার বাবা যখন হল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখন আমার জন্য একটা পুতুল এনেছিলেন। আমি তার নাম দিয়েছিলাম ডোবিনা। আমি ডোবিনাকে রোজ রাত্রে আমার বিছানায় নিয়ে ঘুমোতাম। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম, ডোবিনা যেন তার দেশ হল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। আমি ঘুমের মধ্যে তার কাঠের জুতোর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি তাকে ধরতে গেলাম, কিন্তু সে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আমি ঘুমের মধ্যে কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানায় আমার পাশে হাত দিয়ে দেখি ডোবিনা কোথাও যায়নি, আমার পাশেই শুয়ে আছে।

অনিতা সেনগুপ্ত (বয়স—৮)

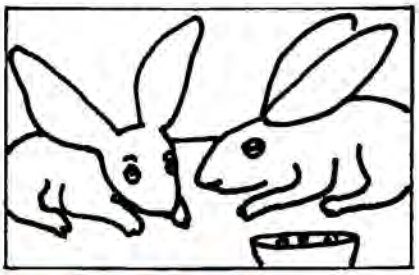

দুষ্টু আর মিষ্টু

আমার দুটি খরগোশ আছে। একজনের নাম দুষ্টু, আর একজনের নাম মিষ্টু। দুষ্টু ভারি দুষ্টু, আর মিষ্টু খুব শান্ত। দুজনেরই গা খুব তুলতুলে। চোখের মণি টুকটুকে লাল। আমি যখন ওদের ছোলা দিই ওরা তখন ছুটে আসে। আমি ওদের গাজর, বীট কলার খোসাও খেতে দিই। শীতকালে ওরা আমার কম্বলের নীচে এসে শুয়ে থাকে।

দীপান্বিতা দাস (বয়স-৮)

পাখি আর বেলুন

আমি একটা লাল টুকটুকে বেলুন কিনেছিলাম। একটা ছোট্ট হলদে পাখি এসে সেই বেলুনটাকে ঠুকরে দিত প্রায়ই। একদিন সে যেই না ঠুকরেছে, অমনি দুম করে ফেটে গেল বেলুনটা। ভীষণ ভয় পেয়ে ছোট্ট পাখিটা জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর দুদিন সে আর এল না। তিনদিনের দিন সে যখন এল তখন আমি আর আমার বোন তাকে আদর করে দুধ-পাঁউরুটি খাওয়ালাম।

শান্তনু ঘোষ (বয়স-১০)

ছোট ভাই

এখন আমার ভাইটি ছোট
কিন্তু বড় হবে,
তখন তোমরা সবাই মিলে
দেখতে তাকে পাবে।
চোখগুলো তার ছোট-ছোট
চুলগুলো তার লাল,
একটুখানি বকলে পরে
কেঁদেই ফোলায় গাল।

শান্তনু চক্রবর্তী (বয়স—১২)

আমরা

আমরা বাংলা মায়ের ছেলে
আমরা বাঙালী বোন-ভাই,
আমরা পেছনদিকে না তাকিয়ে
সামনে এগিয়ে যাই।

রাকেশ মিত্রোলিয়া

পাপাই

ছোট্ট ছেলে পাপাই
বলে, কেমন করে ঝাঁপাই ?
এই বলে ও
পাঁচিলে উঠল,
চিৎকার করে বলল—
ঝাঁপাই ঝাঁপাই ঝাঁপাই।

জয় ভৌমিক (বয়স-৬)

খেলতে পেলাম না

বিকেলবেলা বিষ্টি পড়ে
খেলতে পেলাম না—
বাড়িতে বসে গল্প হল
মাঠে গেলাম না।

সুবর্ণবিকাশ কুমার (বয়স-৮)

ছবি এঁকেছে দীপঙ্করচন্দ্র কর (বয়স ৯)

নরুন দেখে নড়ুন

কুম্ভক

উল বুনতে বুনতে বৌদি বলল : ওপার-বাংলার কথাই যদি তুললে তো আমিও একটা বলি বাপু। ওরা বড়ো র-ড়-এর গোলমাল করে।

কথায়, না লেখায় ?

দুটোতেই। বই পড়া আর জামা পরা যে আলাদা কাজ, সেটা তখন ভুলে যেতে হয়।

তা ঠিক। কিন্তু লেখার কথা যদি বলো বৌদি, সে-ব্যাপারে এপার-বাংলাও কিছু কম যায় না। ও ভুল এখানেও হয়।

যাঃ।

বললে তো হবে না ; আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের লিখতে বলেছিলাম, "সারাদিন ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলাম, তবু কেন সাড়া দাও না ?" অথবা, "আম পাড়ি জাম পাড়ি, তা বলে কি আকাশ পাড়ি দিতে পারি ?" ফল হল আশ্চর্য। কোথায় যে র আর কোথায় যে ড় বসল, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

খোঁজ নিয়ে দেখো, ভুল যারা শিখেছে তারা কোন্ দিকের লোক।

খোঁজ না নিয়ে কি বলছি তোমায় ? অনেকেই তারা পুব বাংলার, সেটা ঠিক। কিন্তু অনেকেই আবার এ অঞ্চলের, এমন-কী খাস কলকাতার।

সত্যি ?

সত্যি নয় তো কী! আসলে কী জানো, লেখার ব্যাপারটাই একটু আলাদা। লিখতে গেলেই অনেকের কলমে একটা জড়তা এসে যায়, জানা জিনিসও ভুল লেখে লোকে, হয়তো অন্যমনস্ক ভাবে। মনটাকে সতর্ক রাখা, এইটেই হল আসল।

টুম্পি মাথা তুলে বলে : কিন্তু কাকু, বই পড়া যে ড় হবে আর জামা পরা র, সেটা বুঝবার কি কোনো পথ আছে ?

একেবারে যে নেই তা নয়। র-ড়-এর গোটা ব্যাপারটাকে হিসেবের মধ্যে পাবি না বটে, তবু কোনো কোনো সময়ে বোঝা যায়।

কেমন করে ?

শব্দটাকে নিয়ে ভাবতে হবে একটু। যেমন ধর্, পড়া। এর একটা ভারি শব্দ বলতে পারিস নন্তু ?

পাঠ। পঠন। অবিশ্যি তুমি কোন্ পড়া বলছ জানি না। পঠন না হয়ে পতনও হতে পারে।

আর, পরা ?

এটা আমি বলব, এটা আমি বলব—বলতে বলতে লাফিয়ে উঠল টুম্পি—পরার ভাল কথা হল পরিধান করা।

তাই তো ? তাহলেই দেখ্, পরিধানের মধ্যে তো ড় নেই, জামাকাপড়ও তাই পরতে হবে। কিন্তু মূল শব্দে যদি ট ঠ ড থাকে, তাহলে আমাদের ড়-ই চাই।

এ-রকম আর কোনো শব্দ বলতে পারো ?

পারব না কেন ? বারি মানে কী ? জল্। আর বাড়ি ? সে এল কোথা থেকে ? বাটী। যেমন শাটী থেকে শাড়ি। রেলিং-এর ওপর সারি সারি শাড়ি শুকোচ্ছে।

আর বারান্দায় মা বড় বড় বড়ি শুকোচ্ছে।

হ্যাঁ, বড়ির কথাও বলা যায়। এই বড়িই বল্ বা ওষুধের বড়ির কথাই বল্, আসছে তো সব বটিকা থেকে।

নন্তু বলল : আর, বড় ? সে আসছে কোথা থেকে ?

পণ্ডিতেরা বলেন ওটারও নাকি মূল হল 'বড্র'। কিন্তু—

কিন্তু অত আমরা জানব কী করে ? বড্র-মড্র, এ-সমস্ত কী ?

সেইটেই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগে তোর মড্র শুনে মনে পড়ল, মেঢ্র বলে একটা শব্দ আছে জানিস তো ? যার থেকে তৈরি হয়েছে মেড়া ? বা ভেড়া ?

কী যে বাজে বাজে কথা বলছ।

বাজে কেন হবে ? ভেড়া বলেই বাজে হল ? তার লোম দিয়ে যে তোর মা উল বুনছে, তার বেলা ? যে কথাটা বলছিলাম, শোন্। অনেক ড়-র ব্যাখ্যা করা যায় শব্দগুলির উৎস পর্যন্ত পৌঁছলে। কিন্তু অনেকেরই আবার সে-রকম কোনো উৎস নেই। কাজেই একে একটা সহজ নিয়মে গেঁথে ফেলা যায় না।

তাহলে, যারা জানে না তারা ঠিক শিখবে কী করে ?

বলতে বলতে, দেখতে দেখতে, অভ্যেস করতে করতে। ওই-যে অনেকদিন আগে বলেছিলাম না, চোখকান খোলা রাখতে হবে ? কথার সময়ে শুনতে হবে পুরো, কান খুলে। পড়ার সময়ে দেখতে হবে পুরো, চোখ মেলে। তাহলেই টের পাবি যে গরু গাছে চড়ে না, মাঠে চরে ; ঝড়ে রাশি রাশি পাতা ঝরে ; মুঠো মুঠো কড়ি নিয়ে খেলা করি ; গড়ের অঙ্কে কেবলই দেখি গরমিল ; আর ওই যে, নাপিত এবার নরুন আনছে নখ কাটবে বলে, টুম্পিদেবী নড়ুন! পালান!

কিস্‌সা কাঠবিড়ালীকা

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছবি সুধীর মৈত্র

নাতনী এলেন কটক থেকে,
সঙ্গে হলো আনা
ক্ষীরী ? পিঠে ? নাড়ু ? খাজা !
না না না না না না।
ছোট্ট বাঁশের টুকরিতে ওই
কী আছে অজানা ?
চমকে উঠি ঢাকা খুলে—
কাঠবিড়ালীর ছানা !

গাছের ডালে বাসা ওদের
ছিল সেথায় খাসা,
কেমন করে ঘটল যে তার
নালার জলে ভাসা !
কারো চোখে পড়েনি, কাক
পায়নি নিশানা
আহা ! ও কি বাঁচত ! ওই
কাঠবিড়ালীর ছানা !

নাতনী ওকে কুড়িয়ে নিয়ে
ফিরিয়ে দিল ডালে
ডাল থেকে সে আবার পড়ে,
কী ছিল কপালে !
ঘরের ভিতর পাতা হল
মশারি বিছানা
বেড়াল যাতে তুলে না নেয়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

নাতনী এলেন কলকাতায়
দেখবে ওকে আর কে ?
তাই তো ওকে আনতে হল
যোধপুর পার্কে।
চোখে চোখে রাখেন ওকে
গোপন ঠিকানা
বিন্দি কুকুর যেন না পায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

দুধ দিলে ও খাবেনাকো
যদি না দাও চিনি,
ফীডিং বটল চুষে চুষে
দুধ খাবেন তিনি।
পাঁউরুটির নরম শাঁস
হয়েছে ওঁর খানা,
শুনছি এখন খই দিলে খান
কাঠবিড়ালীর ছানা।

হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেল
খুঁজে খুঁজে সারা,
ঘরে তখন লোডশেডিং,
কে দেবে পাহারা ?
আলো জ্বলতে পাওয়া গেল
লুকানো আস্তানা,
ট্রাঙ্কের পেছনে ছিল
কাঠবিড়ালীর ছানা।

ক'দিন বাদে নাতনী আবার
কটক ফিরে যাবে
কেমন করে পুষবে ওকে
এই কথা সে ভাবে।
এমন কিছু শক্ত নয়,
পোষ মানালে মানা,
কিন্তু ও যে দুষ্টু বেজায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

কুট করে দেয় কামড়, যেন
আঙুলটা বিস্কুট
একটুখানি ফাঁক যদি পায়
তক্ষুনি দেয় ছুট।
চঞ্চল সে উড়ে যেত
থাকত যদি ডানা,
খাঁচায় ভরে যায় কি পোষা
কাঠবিড়ালীর ছানা !

গাছের ডালেই বাসা ওদের
সেইখানে ও যাবে
ফিরে গেলেই ফিরিয়ে দেবে
নাতনী আমার ভাবে।
ছড়িয়ে রাখা হবে রোজ
চাল ডাল দানা,
আপনি খাবে খুঁটে খুঁটে
কাঠবিড়ালীর ছানা।

বড় হয়ে থাকবে তখন,
কী করবে কাকে ?
চুলবুলিয়ে পালিয়ে যাবে
ফাঁকিবাজ এক ফাঁকে।
পাড়ার কুকুর আসবে তেড়ে,
বেড়াল দেবে হানা,
ল্যাজটি তুলে লাফিয়ে ফেরার
কাঠবিড়ালীর ছানা।

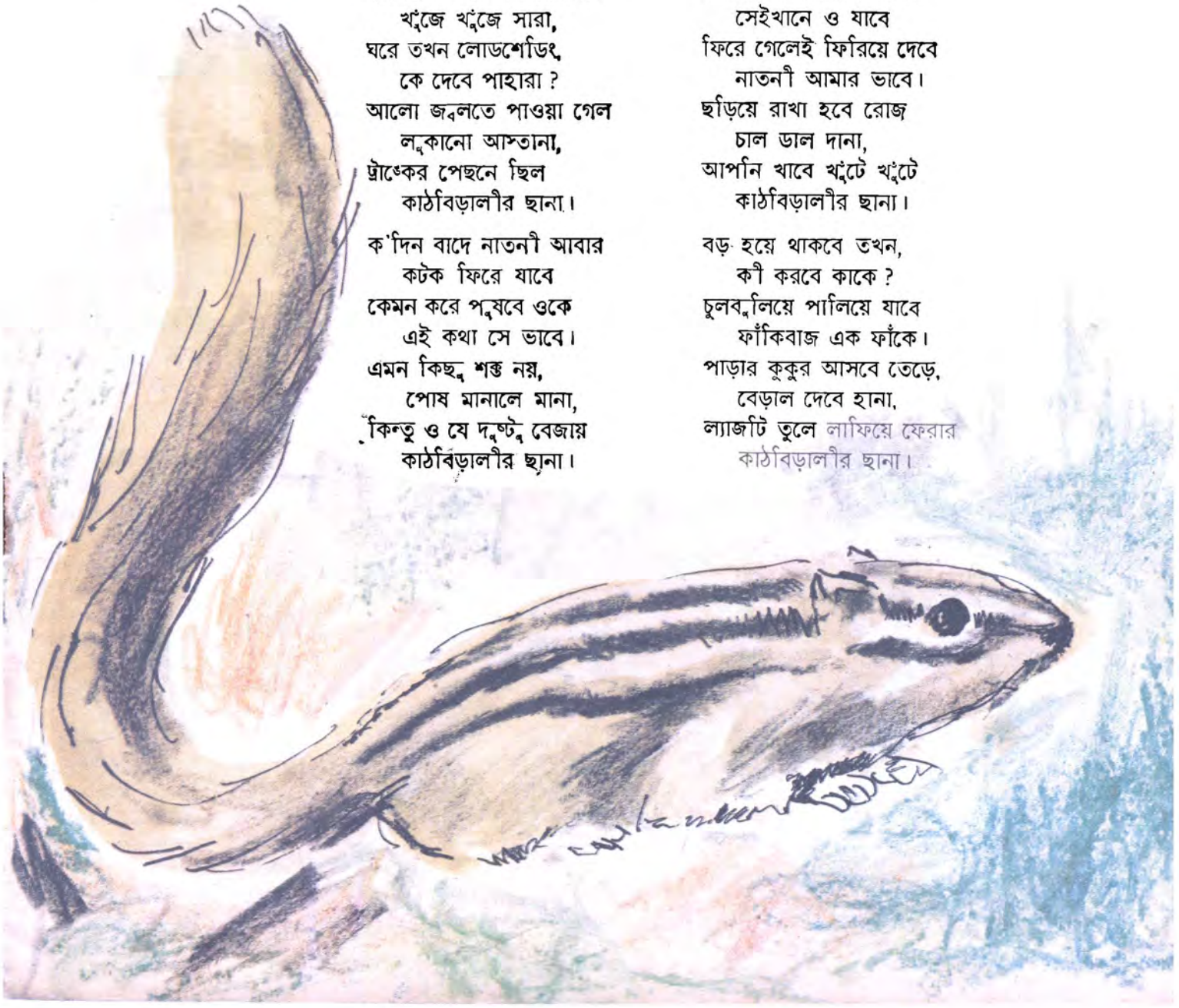

আটখানা

শীতের সার্কাস এক মস্ত বড় আকর্ষণ, সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই। হরেক রকম পোশাক পরে খেলা দেখাচ্ছে খেলোয়াড়রা, ক্লাউনরাও খেলার ফাঁকে-ফাঁকে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তোমরা কি কখনো রাস্তায়-রাস্তায় ময়লা জামাকাপড় পরে যারা সার্কাস দেখায় তাদের দেখেছ? আমি কদিন আগে ভিড় দেখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ওরা তো দারুণ খেলা দেখায়! এক-একজন পাক্কা খেলোয়াড়। বেশ ভাল লাগছিল ওদের খেলা। একজন পা ওপর দিক করে শুধু হাতে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটল। আমি ওকে আটটুকরো দিয়ে তৈরি করে দিয়েছি তোমাদের জন্যে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

২৮ অসিত পাল

ধাঁধা

নানান ধরনের পদবী নিয়ে কথা হচ্ছিল ছোটকার সঙ্গে।

আমাদের ক্লাসে একটা নতুন ছেলে এসেছে। ছেলেটা দেখতে-শুনতে যতটা নিরীহ, কথাবার্তায় মোটেই তেমন নয়। দারুণ মজা করে কথা বলতে পারে। কথার মধ্যে মজা যেমন থাকে, খোঁচাও থাকে তেমনই।

এই তো কদিন আগে, টিফিনের সময়, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "বলো তো সপ্তাহে কটা দিন?"

"কেন, সাতটা?" ওর প্রশ্ন শুনে প্রথমে অবাকই লাগে আমার। ও যেন মোটেই ঠাট্টা করছে না, এমন মুখ করে আবার প্রশ্ন করল, "কী-কী?"

"কী-কী মানে? কী-কী বার?" আমি গড়গড় করে বলে যাই—

"সোম-মঙ্গল-বুধ..."

"ইংরেজিতে বল।" ও হঠাৎ থামিয়ে দিল আমায়।

"সান্‌ডে, মন্‌ডে, টিউস-ডে, ওয়েনস-ডে, থার্স-ডে, ফ্রাই-ডে আর স্যাটার-ডে।"

"হল না। হল না। একটা বাদ গেল।"

"কোনটা?" আমি জানতে চাই।

"সান্‌ডে আর মন্‌ডের মাঝখানে যেটা?"

"সেটা আবার কী?"

ও একটুও না হেসে, গম্ভীর মুখে বলল "পান্ডে।"

আমি হো-হো করে হাসতে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল ও বোধহয় আমাকেই ঠাট্টা করল। একটু আগে পান্ডেজীর হিন্দী ক্লাসে আমি প্রচন্ড ধমক খেয়েছি। ও বোধহয় সেটাই মনে করাতে চাইল। আমি হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। ও দেখি ততক্ষণে আরেক-জনের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে—"গুণধর, শুনে যাও একবার।" যাকে ডাকল, তার নাম গুণধর নয় মোটেই, পুরো নাম নির্মলচন্দ্র গুণ। গুণ থেকে গুণধর বানিয়েছে ছেলেটাকে।

ছোটকাকে ছেলেটার গল্প বলতে গিয়ে পদবীর কথা উঠল। নানান ধরনের পদবীর কথা বলতে-বলতে ছোটকা যে-ধাঁধাটা বানিয়ে ফেলল, বলতে গেলে সেটাও পদবী নিয়েই বানানো। সেই পদবীর ধাঁধা দিয়েই এবার শুরু হোক।

প্রথম ধাঁধা ॥ শ্রীযুক্ত দপ্তরী, শ্রীযুক্ত কনট্র্যাকটর, শ্রীযুক্ত মার্চেন্ট আর শ্রীযুক্ত ইঞ্জিনীয়ার, চারটি পদবীঅলা চার-জন লোক। এদের মধ্যে একজন বই বাঁধান অর্থাৎ দপ্তরী, একজন ঠিকে লোক খাটান অর্থাৎ কনট্র্যাকটর, একজন আড়তদার বা মার্চেন্ট, একজন যন্ত্র চালান বা ইঞ্জিনীয়ার। তবে মজার ব্যাপার হল, কারো পদবীর সঙ্গে ব্যবসার মিল নেই। অর্থাৎ মিঃ দপ্তরী দপ্তরী নন, মিঃ কনট্র্যাকটর কনট্র্যাকটর নন, মিঃ মার্চেন্ট মার্চেন্ট নন, মিঃ ইঞ্জিনীয়ারও ইঞ্জিনীয়ার নন।

নীচে চারটে বাক্য বলা হল। এই বাক্যগুলির মধ্যে তিনটে মিথ্যে। একটিমাত্র সত্যি। একটু তলিয়ে দেখে বলতে পারো, কনট্র্যাকটর অর্থাৎ ঠিকে-লোকের কার-বারী কোন্ জন?

(ক) শ্রীযুক্ত দপ্তরী ই

(খ) শ্রীযুক্ত কনট্র্যাকটর-

(গ) শ্রীযুক্ত মার্চেন্ট ই

(ঘ) শ্রীযুক্ত ইঞ্জিনীয়ার

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একই কার ছেলে হেঁটে কারখানায় যা তিরিশ মিনিট। একদিন বাবা বেরিয়ে গেলেন কারখ বাবাকে ধরে ফেলল। রোজ গতিতেই গিয়েছে দুজনে। ফেলবে ছেলেটি?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ "I comes t ইংরেজি বাক্য কি হতে পারে

চতুর্থ ধাঁধা ॥ ক খ-এর বাবা নয়। কী করে এমন হয়?

পঞ্চম ধাঁধা ॥ গতবারের শেষ তাই নতুন করে দেওয়া হল

নীচের সংখ্যাগুলো মন স্থানে মানানসই সংখ্যাটি ব

১৪ ১

২১ ৮

২৮ ১

গতবারের উত্তর (১) আমরা সেটা যদি থেমে থাকত ত হত। কিন্তু আমাদের ট্রেন মিনিট বাদে দ্বিতীয় যে-ট্র ৫ মিনিট বাদে প্রথম ট্রেনটি সেখানে পৌঁছবে। সুতরাং ১০ মিনিটের। ৫ মিনিটের মাত্র ট্রেন উল্টো দিক থেকে

(২) ২৫টা স্টেশনের বাকী ২৪টা স্টেশনের যে-পারে। তাহলে যত বিভিন্ন পারে, তাদের সংখ্যা হল ২

রিটার্ন টিকিটের হিসে নেই। কেননা আপ-ডাউন প্রতিটি জায়গার জন্যে সে-ক

(৩) চার ভাই আর তি

সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

ইঞ্জিনীয়ার।
র-এর বই-বাঁধাইয়ের ব্যবসা।
ইঞ্জিনীয়ার নন।
মার্চেণ্ট নন।
নায় যায় বাবা আর ছেলে। কুড়ি মিনিটে। বাবার লাগে ছেলের পাঁচ মিনিট আগে থানায়। ছেলে পরে বেরিয়েও হ যেমন যায় সেদিনও সেই কতক্ষণ বাদে বাবাকে ধরে

twice in India"– এ-রকম রে?
বা। খ কিন্তু ক-এর ছেলে

য ধাঁধাটায় ছাপার ভুল ছিল। ন।
ন দিয়ে লক্ষ করে শূন্য-বসাও:

৯ ৫
৮ ১৩
৯ ?

য়া যে-ট্রেন থেকে দেখছিলাম, হলে আমার হিসেব ঠিক ও ছিল চলন্ত। ফলে ৫ টিকে দেখছি, সেটি আরো টকে যেখানে দেখেছিলাম ং দুটি ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান নয়। তাই এক ঘণ্টায় ৬টা ক হাওড়ায় পৌঁছেবে।

প্রত্যেকটা থেকেই যাত্রীরা য-কোনোটার টিকিট কিনতে ধরনের টিকিট দরকার হতে ২৫ × ২৪ = ৬০০।
সব অবশ্যই এর মধ্যে ধরা মিলিয়ে যে আলাদা টিকিট কথা তো আগেই বলা ছিল। তন বোন।

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো: তপন দাশ

গতবারে ছিল রেল-ওয়াগনের ছাতের ছবি, উপর থেকে তোলা।

কিসের ছবি

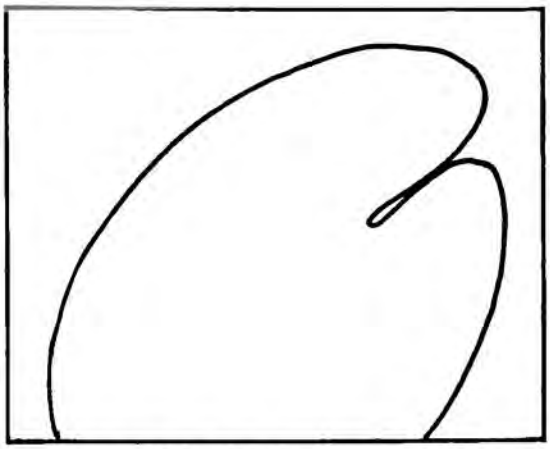

এবারের ছবিটা কঠিন কিছু নয়, বরং বেশ সহজ আর মজার। দেখে প্রথমেই যেটার কথা মনে পড়ে, তা হল বক্সিং লড়ার গ্লাভস। তবে ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবে, বক্সিং প্লাভসের আঙুলও ছোট থাকে বটে তবে অত ছোট নয়। ছবিটা দেখলে আর একটা জিনিসের কথাও মনে হয়। তা হল তেলরঙে ছবি আঁকার কাঠের প্যালেট। তবে মনে রাখবে কাঠের প্যালেটে একটা ফুটো থাকে আঙুল দিয়ে ধরবার জন্যে। তবে? এটা তবে কিসের ছবি? ওঃ, বুঝেছি, এক শীতকাতুরে বুড়ো, বড্ড গরিব, চাদর নেই ওর। রাত্রিবেলা শীতে কাঁপছিল, তাই সারা শরীর কাপড় দিয়ে মুড়ে সকালের রোদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ছবিতে ওর মাথা হাঁটু আর পিঠ দেখা যাচ্ছে।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

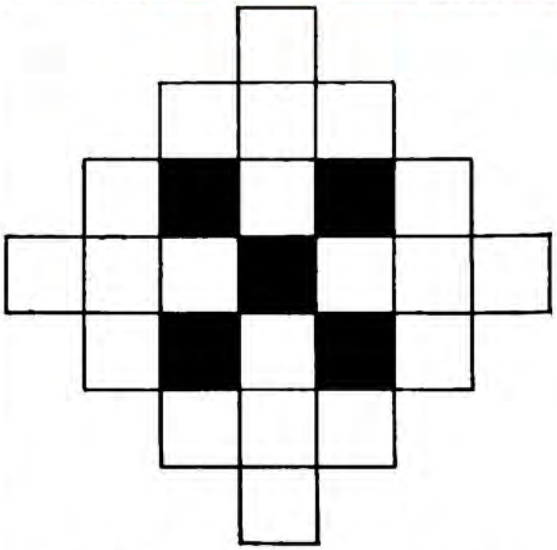

অনেকদিন পরে এবারে আবার একটা ভৌগোলিক শব্দ-সন্ধান দেওয়া গেল। বলা যাক শহর-সন্ধান। লক্ষাধিক মানুষের বাস এমন আটটি ভারতীয় শহরের নাম বসিয়ে এই ছকটি ভরাট করতে হবে। সংকেতের একঘেয়েমি এবার নাই-বা থাকল! অসুবিধে হবে? তবে এক কাজ করো, যে-সব রাজ্যে শহরগুলোর অবস্থান তাদের নামের গায়ে চোখ বুলিয়ে নাও: মহারাষ্ট্র, গুজরাত, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ কেরল, তামিলনাড়ু আর বিহার।

আগামী সংখ্যায় সমাধান

গতবারের সমাধান

১ ক	ই		২ ট্যা		৩ রু	৪ ই
ব		৫ চি	ং	ড়ি		লি
য়ী			রা			শ
		৬ পা		৭ মা		
	৮ স	র		৯ গু	লে	
১০ শো		শে		র		১১ বা
১২ ল	শা				১৩ ন্যা	টা

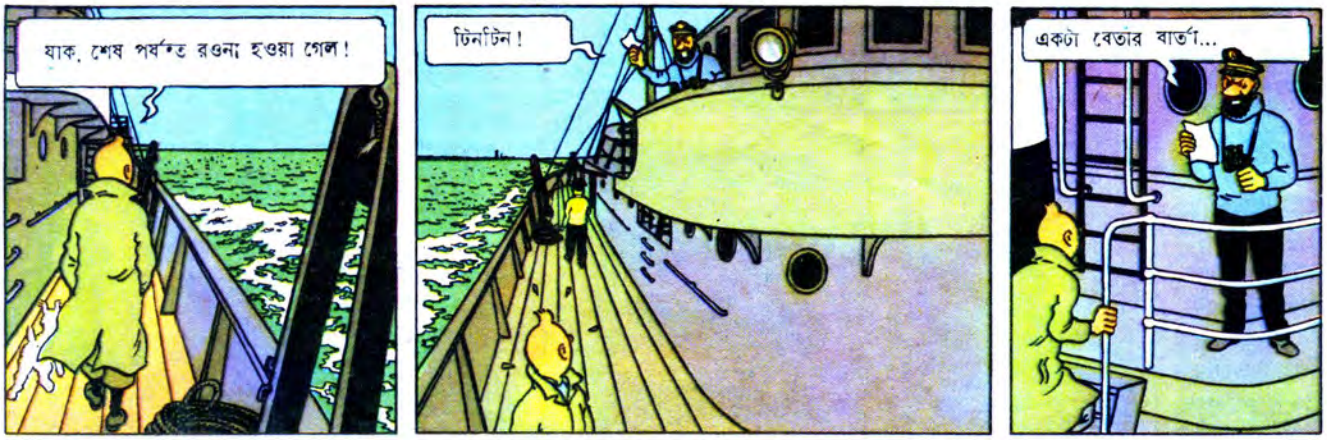
যাক, শেষ পর্যন্ত রওনা হওয়া গেল!
টিনটিন!
একটা বেতার বার্তা...

"বন্দর থেকে সিরিয়াস জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলছি। গতি কমান। একটা মোটরবোট অপনাদের দিকে যাচ্ছে।".
এর মানে কী?
সত্যিই একটা মোটরবোট আসছে।

প্রোফেসর ক্যালকুলাস নয় তো?

না, জনসন আর রনসন। ব্যাপার কী?
আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব।
কেন?
ওপরওয়ালার আদেশ। তোমাদের রক্ষা করতে হবে।
রক্ষা করতে হবে! কার কাছ থেকে?

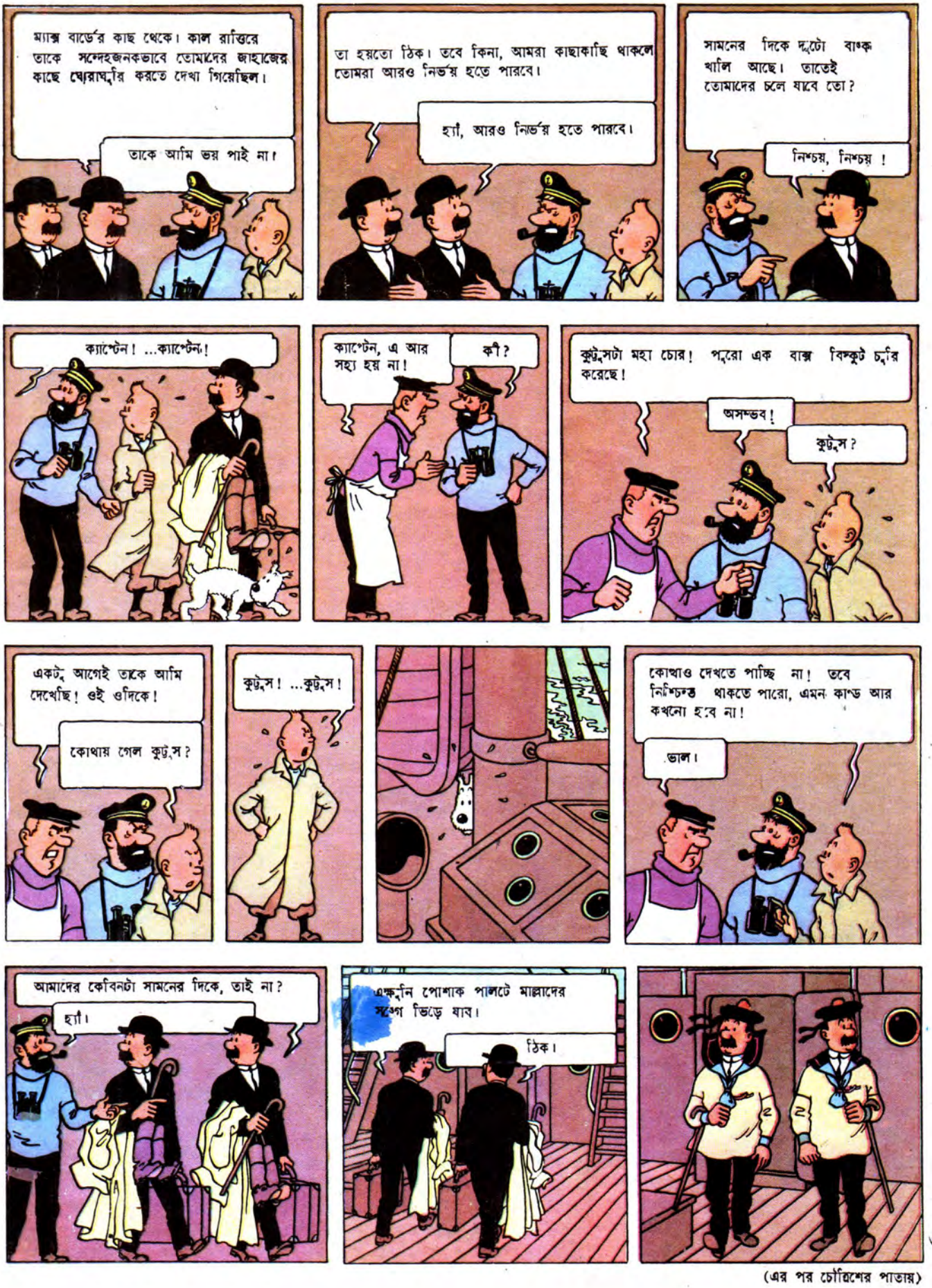

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

হেস্টিংস হাউস বহুমুখী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কী বলেন

বিরানব্বই একর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলিপুরের হেস্টিংস হাউস। রাস্তা থেকে দেখলে মনে হবে, ঘেরা পাঁচিলের ভেতরের বিশাল জায়গায় আছে কোন গলফ্ কোর্স। কিংবা, একটা বোটানিকাল গার্ডেন। বোঝাই যাবে না যে ওখানে মেয়েদের নানারকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। এদেরই একটি হল হেস্টিংস হাউস বহুমুখী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়। কলকাতায় মেয়েদের তিনটি গভর্নমেণ্ট স্কুলের অন্যতম। প্রতিষ্ঠা ১৯৬০-এ।

অল্প সময়ের মধ্যেই খুব নাম করেছে স্কুলটি। উচ্চ-মাধ্যমিকের যুগে হোম-সায়েন্স শাখায় বরাবর চমৎকার ফল করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। প্রথমবার ৪৮ জনকে পাঠানো হয়েছিল; ২৭ জন প্রথম বিভাগে ও ২১ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। গত বছর ৩৯ জনের মধ্যে এক-জন পরীক্ষা দেয়নি, ১৬ জন পেয়েছে প্রথম বিভাগ ও ২২ জন দ্বিতীয় বিভাগ। আগের বছরগুলিতে থার্ড ডিভিশন ছিল। তবে দু'একটির বেশি নয়। সাফল্যের হার শতকরা এক শ। ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রতিবারই আসে। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বীণা রায় (বসু) শিক্ষা নিয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিলেন। এটা কতটা নিজের তাগিদে আর কতটা পরিবেশগুণে তা বলা শক্ত—ওঁদের চার বোনের মধ্যে তিনজনই শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত। শ্রীমতী রায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন থেকে এম এ পাশ করেছেন। তার আগে ডিপ্লোমাও পেতে হয়েছে। "বিদ্যার্থীদের জন্য" অনুষ্ঠানের নিয়মিত শ্রোতারা শ্রীমতী রায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত।

জিজ্ঞেস করলাম, "ভাল ফল করতে গেলে কী দরকার?"

বললেন, "প্রথমেই চাই সিলেবাসের আওতায় যা পড়ছে তার উপর দখল। এই দখল কতটা এসেছে সেটার নিত্যই পরীক্ষা চাই। শুধু স্কুলে নয়—বাড়িতেও। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রচুর অনুশীলন চাই। সোজা কথায়, লেখা। ছাত্রছাত্রীদের স্লোগান হওয়া উচিত 'যেটুকু পড়ব সেটুকু লিখব'। লিখলে অনেক ভুল ধরা পড়ে।"

"কিন্তু এ-সব কথা বার-বার বলা সত্ত্বেও খাতায় আজেবাজে লেখা পাওয়া যায় কেন?"

"নিশ্চয়ই লেখার অভ্যাস করেনি সেই সব পরীক্ষার্থী। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীর উপর পরিবেশগত প্রভাবের কথাটা ভুললে চলবে না। পরিবেশ ভাল না হলে ভাল ছাত্রও খারাপ করে। কারণ, যে মেধা নিয়ে সে জন্মেছে তার সদ্ব্যবহারের সুযোগ সে পায় না।

"ভাল উত্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লেখার ধরন। ভাষার মৌলিকতা থাকবে। বাইরের বই পড়ে, আলোচনা করে উত্তর তৈরি করলে সেটা ভাল হতে বাধ্য। যারা একটা মাত্র বই পড়ে, তাদের চেয়ে তো ভাল হবেই। হাতের লেখার কথাটাও মনে রাখা দরকার। আর বানান ভুল হবে না, উত্তর পয়েন্ট অনুযায়ী লিখতে হবে—এসব তো সাধারণ কথা।

"কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিকসের এম এ পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা বুঝতে পারা যায়নি বলে খাতা দেখতে পারা যায়নি, আর সে জন্যে বহুদিন সকলেরই রেজাল্ট আটকে-ছিল! শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে জানি না।"

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা উঠল। অন্যান্য অনেকের মত শ্রীমতী

রায়ও "ডাইরেক্ট মেথড"-এর মাধ্যমে ইংরেজি পড়ানোর কথা বললেন। আর বললেন, শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে যেতে হবে। ছেলে-মেয়েরা কীভাবে এটা করবে জানতে চাওয়ায় উনি বললেন. "ট্র্যানস্লেশন করবে—যেখানেই দরকার ডিকশনারি ব্যবহার করবে। এ ছাড়া ছোট-ছোট গল্পের বই, খবরের কাগজ পড়তে হবে। আসল কথা, মাতৃভাষা না হলেও ইংরেজিকে অবহেলা করলে চলবে না, ইংরেজিকে ভালবাসতে হবে। আর এই ভাল লাগানোর দায়িত্বের অনেকখানি শিক্ষকের। ইংরেজিকে ছেলে-মেয়েদের কাছে আকর্ষক করে তুলতে পারেন তাঁরাই। শুধু ইংরেজি কেন, সব বিষয়েই জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

"বাংলাতেও শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে যেতে হবে। ভাল ভাল বই পড়ে লেখকদের রচনারীতি লক্ষ করা চাই। সাধু-চলিতের মিশ্রণ আর বানান ভুল এড়ানোর কথা বলা-ই বাহুল্য।"

অঙ্কের কথা ওঠায় শ্রীমতী রায় বললেন, "প্রচণ্ড রকমের প্র্যাকটিস চাই। হোম ওয়ার্ক যা করার তা তো করতেই হবে, তা ছাড়া বাইরের অঙ্কও অনেক বেশি করে করা দরকার।

"নম্বর ওঠার দিক থেকে সংস্কৃত অঙ্কের মতই। তার জন্যে শব্দরূপ, ধাতুরূপ ভালভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। ব্যাকরণ-কৌমুদী খুব ভাল করে পড়া উচিত। টেক্সটও।

"ভূগোলের প্রাকৃতিক অংশ সিলেবাসে নেই, তবুও ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এটা বাদ না দেয়। প্রাকৃতিক ভূগোল বাদ দিয়ে ভূগোলে ভাল ফল করার আশা বৃথা। আর ভূগোল সব সময়েই পড়া দরকার ম্যাপ, চার্ট ও মডেলের মাধ্যমে। যেখানে সম্ভব লেখার সঙ্গে আঁকা চাই। এটা শুধু ভূগোলের ক্ষেত্রে নয়, ইতিহাসের বেলায়ও খাটে। ইতিহাসে উত্তর অযথা বড় হবে না। পয়েন্ট অনুসারে হবে। কিছু ভাল বই থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলে উত্তর ভাল হয়।"

বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে শ্রীমতী রায় ল্যাবরেটরি ব্যবহারের উপর জোর দিলেন। এছাড়া বললেন—ছাত্রছাত্রীরা নিজেই যদি আদর্শ প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর লেখে এবং সেটা দেখিয়ে নিয়ে দরকারমত নতুন কিছু যোগ করে তবে খুবই ভাল হয়।

ওয়ার্ক এডুকেশনে ভাল নম্বর তোলাটা সব সময় ছাত্রছাত্রীর নিজের হাতে থাকে না। ভাল নম্বরের জন্যে উপযুক্ত 'প্রোজেক্ট' নির্বাচন দরকার। শ্রীমতী রায়ের স্কুলের একটি ছাত্রী গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিষয়ে 'লেটার' পেয়েছে। উনি বললেন, মেয়েদের পক্ষে রান্না আর ছেলেদের বেলায় উদ্যান-চর্চা প্রোজেক্ট ভাল।

মাসিক আনন্দমেলার লেখাপড়া ও ধাঁধা বিভাগ দুটি শ্রীমতী রায়ের খুব প্রিয়। সেইরকম, পূজা সংখ্যায় হেড এগজামিনারদের উপদেশগুলি।

কী ভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

শম্পা ঘোষাল কিন্তু নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে ওঠেনি। ফার্স্ট হয়েছিল শুভ্রা দাশ। টেন-এর সব পরীক্ষাতেই শম্পা ফার্স্ট। টেস্টেও। শম্পা আর শুভ্রাতে জোর প্রতিযোগিতা।

কাঁকুলিয়া রোড থেকে আলিপুর আসতে শম্পার অসুবিধা হয় না—স্কুলের বাসে আসে। বাবা শম্ভুনাথ ঘোষাল সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েতে কাজ করেন।

শম্পা টেস্টে ৮০০-র নীচে নম্বর পেলেও আশা রাখে, ফাইনাল পরীক্ষায় বেশ উপরের দিকেই থাকবে।

তার প্রস্তুতি কী রকম ভাবে করছে জানতে চাইলাম। বলল, "দিনে আট-ন' ঘন্টা পড়ি। অনেক রেফারেন্স বই জোগাড় করেছি, সেগুলো দেখে বাড়তি পয়েন্ট সংগ্রহ করি। টেস্ট পেপার্স থেকে বেছে বেছে প্রশ্ন বার করে উত্তর লিখি।"

"উত্তর কে দেখে দেন?"

জানাল, ওর গৃহশিক্ষক আছেন। তাছাড়া একটি কোচিং স্কুলেও ও পড়তে যায়।

শম্পার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে। তাই বলে ওর প্রিয় বিষয় লাইফ সায়েন্স নয়। অঙ্ক। রোজ অন্তত দেড় ঘন্টা অঙ্ক করা চাই শম্পার। কেশব নাগ আর কে পি বসুর বই এবং টেস্ট পেপার্স ও নিয়মিত ব্যবহার করে। টেস্ট পেপার্সে এক একটা স্কুল ধরে প্রশ্নপত্রের উত্তর করে। অবশ্য সবচেয়ে আগে স্কুলের বইটি (শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ) দেখে। ওর ঐচ্ছিক বিষয়ও অঙ্ক।

শম্পা ইতিহাসে পড়ে দিলীপ ঘোষ, অরুণ সেন, এ সি রায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের বই এবং কিরণ চৌধুরীর হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের বইটি। ভূগোলে লোকেশ চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় আর ভারত ও ভূমণ্ডল।

"সায়েন্স সাবজেক্টে?"

"ফিজিক্যালে স্কুলের বই (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ) ছাড়া হায়ার সেকেন্ডারির দুটো বই পড়ি, সি আর দাশগুপ্ত আর সমর গুহ। লাইফ সায়েন্সে বুকলিস্টে আছে তারকমোহন দাস আর সমর ঘোষ-এর বই। এ ছাড়া পড়ি কার্ত্তিক মণ্ডল, রবীন্দ্রনারায়ণ পাল আর কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু।"

ইংরেজি, বাংলা আর সংস্কৃতে শম্পা খুব বেশি বাইরের বই পড়ে না। ইংরেজিতে বাইরের অংশের জন্য ওদের স্কুলে ব্যোমকেশ ঘোষের বই পড়ানো হয়। সেটাই ও খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে। তবে বাংলায় ডঃ সুধীর দাশগুপ্তের 'বাণীদীপ' অমরনাথ ঘোষ, দ্বিজমোহন সরকারের বই ছাড়াও হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের জন্যে লেখা জগদীশ ঘোষের বই পড়ে। সংস্কৃতে দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত ব্যাকরণকৌমুদী ও "হেল্পস্ টু দি স্টাডি"।

শম্পা অবসর-সময়ে গল্পের বই পড়ে কিংবা ছোট বোনের সঙ্গে খেলা করে। ওর প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র। সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ওর ভাল লাগে। শম্পা গানও শেখে। তবে এ-বছরটা বন্ধ আছে।

আনন্দমেলা-র লেখাপড়া বিভাগ ওর দারুণ ভাল লাগে। কেননা "বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা অন্য কোথাও জানতে পারি না।"

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফোটো তপন দাশ ৩৩

(একত্রিশের পাতার পর)

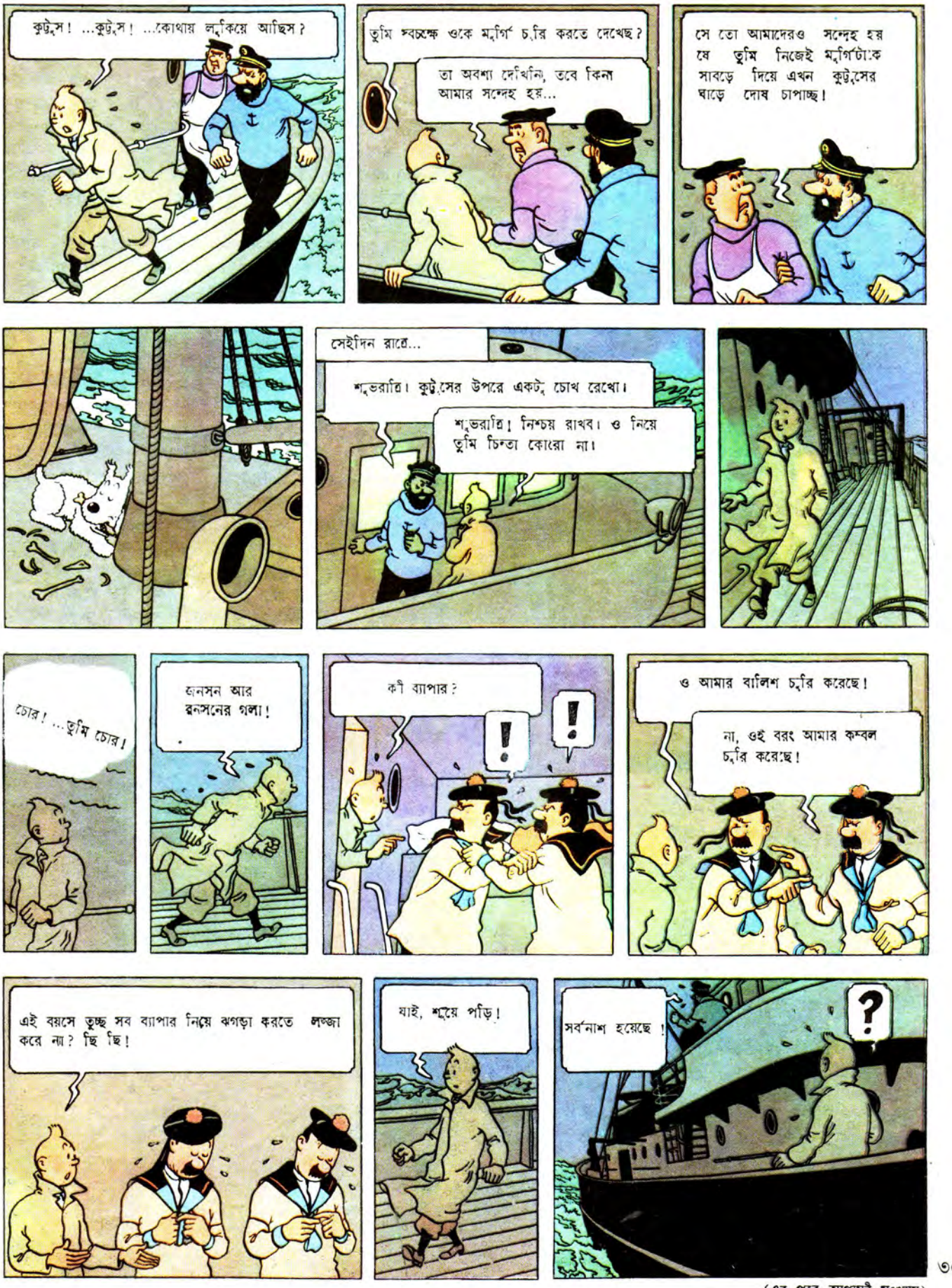

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা আর মানিকের একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বন্ধু মানিক এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদা একাই বসে ছিল সিনেমায়। তার পাশে এসে বসল অচেনা এক ভদ্রলোক। সিটে বসে-বসেই লোকটি কখন যেন মরে গেল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। নীচে মানিকের সঙ্গে দেখা। মানিক তাকে যেতে দিল না। সামান্য পরে দেখা গেল, মরা লোক জ্যান্ত হয়ে দিব্যি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বরদা আর মানিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। অবশ্য এইসব গবেষণা কলকাতার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়। সিদ্ধেশ্বরের অনুরোধে বরদা শেষ পর্যন্ত দুমকার সেই সেন্টারে যেতে রাজি হল। তবে যাবার আগে জানতে পারল, সেখানে বরদার মতই দেখতে একজন লোক রয়েছে—নাম মহাদেব। লোকটা সন্দেহজনক।

৭

বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ পাওয়া গেল না।

বরদার ভাল লাগছিল না। সকালের দিকে তার মন-মেজাজ মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু টাঙাঅলার খবরটা শোনার পর থেকেই বরদা কেমন মনমরা হয়ে গেল। বরদা এখানে একা। জায়গাটাও তার চেনা নয়। আর পি পি রিসার্চ সেন্টার তো একটা পাগল-টাগলদের আড্ডাখানা। এই রকম একটা জায়গায় বরদার একমাত্র ভরসা সিদ্ধেশ্বর। তিনিও নেই। টাঙাঅলার যে কী হল, সে মরল না বাঁচল, কাকে জিজ্ঞেস করবে বরদা? জনা দুই লোক—এখানে যারা কাজকর্ম করে—তারাও সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে চলে গেছে। বাদবাকি যারা, তারা কোনো খবর রাখছে বলেও মনে হল না বরদার।

কেমন একটা উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মধ্যে দুপুরটা কাটল। এমনিতে তার কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না, স্নান-খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুর নয়, কিন্তু বরদাকে যে-লোকটা দেখাশোনা করছিল সে টাঙাঅলা কিংবা সিদ্ধেশ্বরের খবর কিছুই দিতে পারল না।

বরদার মাথায় নানারকম চিন্তা আসছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, যে টাঙাগাড়ি করে কাল তারা এতটা পথ এল, সেই টাঙার ঘোড়াটা হঠাৎ এই জায়গাটার কাছাকাছি এসে ওরকম লাফঝাঁপ শুরু করল কেন? ঘোড়াটা নিশ্চয় বুনো নয়, খেপা নয়। যদি খেপা ঘোড়া হত, টাঙাঅলা কি তাকে গাড়িতে জুড়ে নিত? অসম্ভব। সিদ্ধেশ্বর কাল বলেছিলেন, সব ঘোড়াই নাকি মাঝে-মাঝে পা ছোঁড়ে, চেঁচায়, লাফিয়ে ওঠে। যদি তাই হয়, তবে আজ আবার সেই ঘোড়াটাই টাঙাঅলাকে মাঝমাঠে ফেলে দিয়ে পালাবে কেন?

কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না বরদা। ব্যাপারটা তার কাছে সহজ বা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না।

দুপুরে শুয়ে-শুয়ে বরদার রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কলকাতা ছেড়ে এইভাবে চলে আসা তার উচিত হয়নি। মানিক বারণও করেছিল। বরদা ঝোঁকের মাথায় চলে এল—সিদ্ধেশ্বরকে ভরসা করে। সিদ্ধেশ্বরকে কতটুকু চেনে বরদা? মুখের কথায় বিশ্বাস করেছে সে। কে বলতে পারে, সিদ্ধেশ্বর মুখে যা বলেছেন, কাজে তার উলটো করবেন না? মানুষকে কি এত সহজে বিশ্বাস করা ঠিক হয়েছে!

দুপুর ফুরিয়ে বিকেল হল। বরদা বাইরে এসে দাঁড়াল একবার। এখনও রোদ রয়েছে গাছের মাথায়, আকাশ পরিষ্কার, জঙ্গলের বাতাস আসছিল, মাটির গন্ধও নাকে আসে। কিন্তু পুরো জায়গাটাই কেমন চুপচাপ। দু-চারজনকে চোখে পড়লেও যে যার নিজের মতন কাজকর্ম করে যাচ্ছে। মনেই হয় না, টাঙা-অলাকে নিয়ে কারও কোনো দুশ্চিন্তা রয়েছে।

বরদা ঠিক করল, সে এখানে থাকবে না। কালই চলে যাবে। সিদ্ধেশ্বরকে বলবে, "আমায় ছেড়ে দিন মশাই, আমি আপনাদের এসবের মধ্যে নেই, আমার ভাল লাগছে না।"

বিরক্ত হয়েই বরদা তার ঘরের সামনে পায়চারি করছিল, বিকেলও ফুরিয়ে এল, এমন সময় সিদ্ধেশ্বরকে দেখা গেল; তিনি ফিরলেন।

বরদা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিদ্ধেশ্বরের কাছে গেল।

কাছে গিয়েই থমকে গেল। মানুষটিকে যেন আর চেনা যায় না। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেমন চেহারা হয়ে গেছে সিদ্ধেশ্বরের। ধুলোয় ভরা বেশবাস। মাথার চুল রুক্ষ, এলো-মেলো; সমস্ত মুখ কালচে, শুকনো। ভীষণ ক্লান্ত, হতাশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে। একটা চোখ আরও ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে।

বরদা টাঙাঅলার কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "পরে বলব। সন্ধেবেলায়। আপনার ঘরে আসব।"

কোনো কথা বলার সুযোগই হল না বরদার; সিদ্ধেশ্বর ক্লান্ত পায়ে চলে গেলেন। বরদার মনে হল, টাঙাঅলা আর বেঁচে নেই।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল বরদার। আহা, বেচারা টাঙাঅলা!

সন্ধেবেলায় ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল।

বরদা বিছানায় বসে। সিদ্ধেশ্বর ঘরে এলেন।

হাতমুখ ধুয়েমুছে, জামাটামা পালটে সামান্য ভালই দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে, অন্তত বিকেলের সেই ঝোড়ো চেহারা আর তেমন প্রকটভাবে চোখে পড়ছিল না।

বরদা বলল, "আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

সিদ্ধেশ্বর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বরদার কাছাকাছি বসলেন।

বরদা বলল, "টাঙাঅলা বেঁচে আছে?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর ধীরে-ধীরে। "না।"

বরদা যেন জানত কথাটা। চমকাল না। কিন্তু মুখ কালো হয়ে গেল।

চুপচাপ। বরদা কয়েক পলক সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ সরাল। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল তার। সিদ্ধেশ্বরও কেমন বিষণ্ণ মুখ করে বসে থাকলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনার কাছে সিগারেট আছে? দিন তো একটা, খাই।"

বরদার সিগারেট কমে এসেছিল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

সিদ্ধেশ্বর একটা সিগারেট নিয়ে দেশলাই চাইলেন।

বরদা এই ক'দিনের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরকে সিগারেট খেতে দেখেনি। এই প্রথম। হয়ত মানসিক অস্থিরতার জন্যে সিদ্ধেশ্বর সিগারেট খেতে চাইছেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি ছিলাম না আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

"না।"

"সময়মতন খাবার দিয়ে গিয়েছিল?"

"দিয়েছিল।"

"বিকেলে চা-জলখাবার পেয়েছেন?"

"চা খেয়েছি। জলখাবার খাইনি। ইচ্ছে করছিল না।"

"আর একবার দেবে। চা আনতে বলে এসেছি।"

বরদা অধৈর্য হয়ে বলল, "টাঙাঅলার কথা বলুন।"

সিদ্ধেশ্বর যেন চোখ সরিয়ে নিলেন। "কী বলব?"

"টাঙাঅলা কি মাঠেই মরে পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"টাঙাটা ছিল?"

"কাছে ছিল না। দূরে ছিল। উলটে পড়ে ছিল, কাত হয়ে।"

"ঘোড়াটা?"

"জানি না।"

বরদা বেশ বুঝতে পারল, তার বুকের মধ্যে কেমন ধকধক করছে। উত্তেজনা, না ভয়?

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি টাঙাঅলাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন?"

মাথা হেলালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমি জানতাম ও মারা গেছে। তবু নানা রকম চেষ্টা করে দূরের একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, "টাঙা থেকে পড়ে কেউ ওভাবে মরে না।"

বুঝল না বরদা। "মানে?"

"মানে, কেউ টাঙা থেকে পড়ে গেলে ওভাবে মরে বলে আমার মনে হল না!"

"কী মনে হল আপনার?"

সিদ্ধেশ্বর আলগা করে সিগারেটে টান দিলেন, অন্যমনস্ক। বললেন, "আমার মনে হল কেউ যেন ওর ঘাড় ভেঙে দিয়েছে—যাকে আমরা মটকানো বলি। মাথার চেয়ে ঘাড়ই বেশি জখম। শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "টাঙা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে যেতে পারে না? নাকি শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে না?"

"পারে হয়ত। কিন্তু আমি যা চোখে দেখেছি, তাতে আমার মনে হল, আসুরিক কোনো শক্তি যেন তার ঘাড় ভেঙে মাথা মুখ প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ফেলেছে।"

বরদা চোখ বন্ধ করে ফেলল প্রায়। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মাঠে টাঙাঅলাকে দেখতে যাবার একটা ইচ্ছে সকালে তার একবার হয়েছিল। ভাগ্যিস যায়নি। সিদ্ধেশ্বর যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তবে সেই দৃশ্য বরদা দেখতে পারত না চোখে। মানুষের মুখ যদি উলটে ঘাড়ের দিকে চলে যায়—কী বীভৎস না দেখতে লাগে!

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "অথচ, দিনের বেলায় ফাঁকা মাঠে কে আর আসবে ওকে মারতে?"

"আপনি—" বরদা বলল, "আপনি মারার কথা কেন বলছেন?"

"জানি না। মনে হচ্ছে।"

"হাসপাতালে কিছু বলল না?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনারা কলকাতার

লোক, যা হয় সবই কলকাতার চোখ নিয়ে দেখেন। এখানে অত ব্যবস্থা নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট একটা হাসপাতাল। জ্বর-জ্বালার মিক্সচার দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তবু নেহাত দায়ে পড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। মরা মানুষকে হাসপাতালে দিয়ে কী আর লাভ হবে বলুন!" সিদ্ধেশ্বর বললেন ক্ষোভের গলায়।

বরদা কথা বলল না। সিদ্ধেশ্বর হয়ত ঠিকই বলেছেন, এই দেহাতের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কলকাতা হলে অন্য কথা ছিল।

"ওর লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল সকালে পোড়াতে নিয়ে যাবে।"

"হাসপাতালেই রেখে এসেছেন ডেড্ বডি?"

"হ্যাঁ।"

"তবু ডাক্তার কিছু বলল না দেখে শুনে?"

"না। টাঙা থেকে পড়ে মাথায়, ঘাড়ে-পিঠে চোট খেয়েছে শুনে খাতায় বোধ হয় লিখে নিল।"

"তার মানে অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ্?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "হ্যাঁ।"

দরজায় শব্দ হল।

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। দরজা খুলে দিলেন।

চা নিয়ে এসেছিল একজন। চা দিয়ে চলে গেল।

দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। চা খেতে-খেতে বললেন, "আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

চোখ তুলে তাকাল বরদা। "আমারও কেমন লাগছে! কাল আমরা যখন আসছিলাম, টাঙার ঘোড়াটা কোনো গোল-মাল করেনি। হঠাৎ এখানে এসে ওরকম খেপার মতন লাফাতে লাগল কেন?"

সিদ্ধেশ্বর নীরব থাকলেন।

অপেক্ষা করে বরদা বললেন, "আজ সকালে আমি ঘোড়াটাকে দেখেছি। গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আজ তো সে শান্তই ছিল। অবশ্য, আমি দূর থেকে দেখেছি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ঘোড়াটা গাড়িতে জুতে নেবার সময় টাঙাওলা নিশ্চয় দেখেছিল। তার যদি মনে হত, ঘোড়া বেচাল রয়েছে, গাড়িতে জুতে নিত না।"

"তা হলে?"

সিদ্ধেশ্বর অন্যমনস্ক গম্ভীর মুখে বললেন, "তাই ভাবছি।"

বরদা চা খেতে-খেতে বলল, "আপনাদের এখানে নানারকম অদ্ভুত মানুষ থাকে। তারা অবাক-অবাক কাণ্ড করতে পারে। আপনিই বলেছেন। এদের মধ্যে এমন কি কেউ রয়েছে, যে এইসব করতে পারে? মানে এমন কেউ কি আছে যার শয়তানি করার অশেষ ক্ষমতা?"

সিদ্ধেশ্বর কয়েক পলক দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চুপচাপ। চা খেলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "ছিল। এখন নেই।"

"মানে?" বরদা কেমন চমকে উঠল। "মহাদেব ছাড়া আরও শয়তান ছিল?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "এই কাজটা মহাদেবের নিজের হাতে করার নয়। তার এরকম কোনো ক্ষমতা নেই। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।"

"কে?"

"আপনি তাকে দেখেননি। সুজন মালাকার।"

বরদার কানে নামটা নতুন শোনাল। সকালে সিদ্ধেশ্বর খাতা

ঝন্টু মন্টু ও ন্যাড়াপোড়া

চিত্র-পরাগ রায়
বয়স-১২ বছর

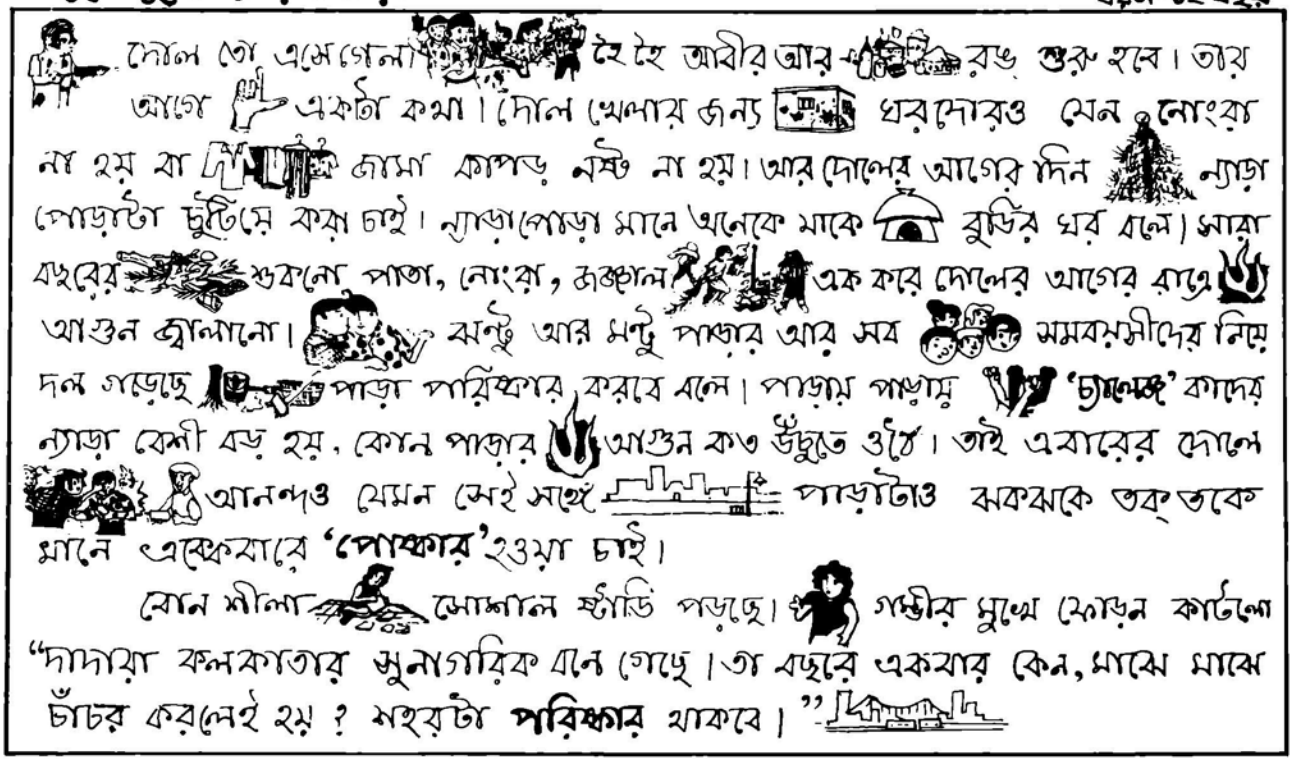

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,- ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

খুলে যাদের নামধাম পরিচয়ের কথা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে সুজন মালাকার ছিল না। থাকার কথাও নয়। কেননা সিদ্ধেশ্বর জনা দুয়েকের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন মাত্র, বাকীদের পারেননি। টাঙাঅলার খবর শুনে খাতা ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া সুজন তো এখন নেই, বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, "সুজন মালাকার! নাম যার সুজন সে এত—"

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সুজন নিজে যে শয়তান ছিল তা নয়। কিন্তু তার এমন কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা মানুষের অনেক সময় ক্ষতি করতে পারে। কেউ যদি সুজনকে কাজে লাগাতে চায়, লাগাতে পারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজনকে কেউ কাজে লাগিয়েছে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "মহাদেব কি সুজনকে হাত করেছে?"

"করতে পারে।"

"আপনি কি তাকেই সন্দেহ করছেন?"

"অন্য কারুর কথা মনে পড়ছে না। টাঙাঅলা যে-ভাবে মারা গেছে তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজন ওই টাঙায় উঠেছিল। কোথা থেকে উঠেছিল আমি জানি না। তাকে কেউ দেখেনি। সুজনকে এমনিতে দেখলে মনেই হবে না, তার আসুরিক কোনো শারীরিক শক্তি আছে। কিন্তু এক-এক সময় তার বেঁটেখাটো রোগাটে চেহারায় আসুরিক এক শক্তি এসে হাজির হয়। সে-শক্তি আমরা কল্পনা করতে পারব না।"

"কিন্তু টাঙাঅলার সঙ্গে তার শত্রুতা কিসের?"

"কোনো শত্রুতাই থাকার কথা নয়।"

"তবে?"

"বুঝতে পারছি না।"

বরদা সামান্য চুপচাপ থেকে শেষে বলল, "সুজন এখন কোথায় থাকে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখানে কিছুদিন ছিল। মাস কয়েক। তাকে এখানে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা তাকে আর রাখতে চাইলাম না। এমনিতে তো ভালই, সাদামাটা, কিন্তু এক এক সময় তাকে কোনো শয়তান যেন ভর করত। তখন তাকে সামলাবার সাধ্য আমাদের ছিল না। ও ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তখন আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই।"

"সেই রাগেই কি—"

"না না। তা মনে হয় না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সুজন এদিকে আর নেই। আজ আমার মনে হচ্ছে, সুজন কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।"

বরদা জিজ্ঞেস করল, "সুজনকে আপনারা কতদিন আগে তাড়িয়ে দিয়েছেন?"

"মাসখানেক আগে।"

বরদা কী ভেবে বলল, "মহাদেব তাহলে সুজনকে চেনে?"

"চেনে। ভাল করেই।"

"তাহলে কি মহাদেবের কোনো হাত আছে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অসম্ভব নয়।"

বরদা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সিদ্ধেশ্বর উঠে পড়লেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবেন। কাল সকালে কথা হবে।"

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন। (ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

অ্যান্টার্কটিকা

পৃথিবীর উত্তর মেরুবিন্দু ঘিরে আছে উত্তর মহাসাগর, কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দু একটি মহাদেশের ওপর অবস্থিত—এই মহাদেশের নাম অ্যান্টার্কটিকা। এই মহাদেশটি অন্যান্য মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও চারিদিক সমুদ্রে ঘেরা। এই মহাদেশের বেশির ভাগ জায়গাই পুরু বরফের চাদরে ঢাকা। অনেক জায়গায় এই বরফের স্তর আসল মাটি থেকে দু মাইল পর্যন্ত উঁচু। সেই জন্যে, বরফের স্তরের নীচে এই মহাদেশের ভূ-প্রকৃতি কেমন, তা শুধু অনেক জায়গায় অনুমান করে নেওয়া হয়েছে।

অনুমান করা হয়, পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ বরফ এই অ্যান্টার্কটিকাতেই জমা আছে। এই বরফ যদি গলে যায়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জলের উচ্চতাও ভীষণভাবে বেড়ে যাবে এবং তার ফলে বেশির ভাগ শহরই জলের তলায় ডুবে যাবে। কিন্তু এখানে যে-সব ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, এই মহাদেশ চিরদিনই এই রকম বরফে ঢাকা ছিল না, ছিল গাছপালায় সবুজ এবং এর জলবায়ুও ছিল উষ্ণ। এখানে এখন অবশ্য যে-রকম শীত, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরমকাল। সেই জন্যে অ্যান্টার্কটিকার আসল শীতকাল জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত। তবে যে জায়গা সারা বছরই বরফের তলায় ঢাকা পড়ে থাকে, সেখানে আর শীত-গ্রীষ্মের তফাতটা কী। কিন্তু তাপমাত্রা বিচার করলে তফাত বেশ ধরা যায়। অ্যান্টার্কটিকায় ব্রিটিশ আমেরিকান, রাশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার জন্যে যে-সব কেন্দ্র তৈরি করেছেন, সেই সব কেন্দ্রের তাপমাপক যন্ত্রে তাপমাত্রার হেরফের ধরা পড়ে। এর মধ্যে পৃথিবীর সবনিম্ন তাপমাত্রা ধরা পড়েছে ভস্টক্ নামক একটি কেন্দ্রে—আগস্ট মাসে শূন্যের চেয়েও ১২৬·৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম। মাত্র ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটেই যেখানে জল জমে যায়, সেখানে এই ঠাণ্ডা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। জানুয়ারি মাসেও, অর্থাৎ এখানে যখন গরমকাল—তখনও এখানকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম থাকে।

মানুষ এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না, স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে আছে পেঙ্গুইন, সীল মাছ আর খুব অল্পসংখ্যক পোকামাকড়।

পৃথিবীর দক্ষিণে যে একটি মহাদেশ আছে, এ-কথা বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তারপর তিমি-শিকারীরা জাহাজে করে শিকার করতে এসে এই মহাদেশের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। কে প্রথম এই মহাদেশ খুঁজে বার করেছিল, এ সম্বন্ধে নানা রকম মতবিরোধ আছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে সবচেয়ে প্রথমে গিয়ে পৌঁছেছিলেন নরওয়ের অধিবাসী আমুণ্ডসেন—১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। তার কিছুদিন পরেই ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্কট দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে পৌঁছে ফেরার পথে বরফের ঝড়ে সদলবলে মারা গেলেন।

পরাজয় থেকে জয়ে

পুষ্পেন সরকার

তৃতীয় টেস্টে ভারত জিতেছে ২২২ রানে। প্রথম দুটি টেস্টে অল্পের জন্য হেরেছিল। এবার পরাজয়ের পাল্টা জবাব দিয়েছে গৌরবের সঙ্গে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের প্রথম জয়। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলা হচ্ছে। তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত মোট ২৮টি টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৮। ভারতের ৪।

দু' দেশের সাতটি সিরিজের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় আগে খেলা হয়েছে দুবার। ১৯৪৭-৪৮ সালে লালা অমরনাথের নেতৃত্বে ভারত ডন ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দলের কাছে ৪টি টেস্ট হেরে এবং একটি ড্র করে ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার ১৯৬৭-৬৮ সালে পতৌদির নেতৃত্বে ভারত অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। সিম্পসন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। ভারত ৪টি টেস্টেই হারে।

(বাঁয়ে) চন্দ্রশেখর
(উপরে) মহীন্দর অমরনাথ
(নীচে) সুনীল গাভাসকর

ভারত সফরে এসেছে অস্ট্রেলিয়া ৪বার। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইয়ান জনসন, ১৯৫৯-৬০ সালে রিচি বেনো, ১৯৬৪-৬৫ সালে সিম্পসন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে বিল লরির অধিনায়কতায় অস্ট্রেলিয়া ভারতে খেলে গেছে। এই চারটি সিরিজের মধ্যে ভারত ১৯৫৯-৬০ সালে, ১৯৬৪-৬৫ সালে এবং ১৯৬৯-৭০ সালে একটি করে টেস্ট জেতে।

মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টে জয়ের প্রধান কৃতিত্ব গাভাসকর ও চন্দ্রশেখরের। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার আগে দ্বিতীয় টেস্টের কথা কিছু বলে নেব। প্রথম টেস্টের মত দ্বিতীয় টেস্টেও ভারত অল্পের জন্য হেরে যায়। দুই উইকেটে পরাজয়ের মধ্যে কোন অগৌরব ছিল না। ক্রিকেট অনিশ্চয়তায় ভরা। ক্রিকেট-পণ্ডিতরা বলেন, শেষ বলটি না খেলা পর্যন্ত ফল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে নেই। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের ফল সম্বন্ধে সেই অনিশ্চয়তা ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কে জিতবে, কে হারবে সেটা জানা গিয়েছিল মাত্র ২২টি বল বাকি থাকতে। ক্রিকেট ইতিহাসে উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তি হিসাবে যে টেস্ট খেলাগুলির উল্লেখ করা হয়, এই দ্বিতীয় টেস্টটিও তার মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য।

বিশেষ করে শেষ দিনের শেষ দুটি ঘণ্টার খেলার কথা ভুলতে পারবে না কেউ। প্রতি মুহূর্তে ছিল উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ভরা। একবার মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়া জিতবে। আবার পরক্ষণেই ভারতের জয়ের আশা উজ্জ্বল করে তুলেছেন বোলাররা। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকেন সকলে। রেডিওতে কান পেতে থাকেন ভারতের ক্রিকেট-উৎসাহীরা।

খেলার শেষদিকে অবস্থা দাঁড়ায়, অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে ৩৩০ রান। দুটি উইকেট চাই ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৯টি রানের। নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকেন সকলে। বেদী ও বেঙ্কটরাঘবন বল করছেন। ব্যাট করছেন ক্লার্ক ও টমসন। ব্যাটসম্যান হিসাবে কারোরই সুনাম নেই। দুজনেই বোলার। যে-কোন মুহূর্তে আউট হতে পারেন। কিন্তু আউট হলেন না। জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে দিলেন দুজনে। ৮ উইকেটে ৩৪২। ভারত প্রথম ইনিংসে করেছিল ৪০২, অস্ট্রেলিয়া ৩৯৪। ভারত ৯ উইকেটে ৩৩০ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল ৩৩৯।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সব থেকে বড় ইনিংস ৪০২। ১৯৪৭-৪৮ সালে অ্যাডিলেড টেস্টের ৩৮১ রানের রেকর্ড ভেঙে ভারতের নতুন রেকর্ড। ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে মহীন্দর অমরনাথ দুই ইনিংসেই ভাল ব্যাট করেন (৯০ ও ১০০)। টেস্টে মহীন্দরের প্রথম শতরান। এ ছাড়া প্রথম ইনিংসে চেতন চৌহান (৮৮), তরুণ বেংসরকর (৪৯) এবং শেষ দিকে মদনলালের বেপরোয়া ব্যাটিং (৪৩) উল্লেখযোগ্য হয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে গাভাসকর করেন ১২৭। চতুর্থ ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে তিনি টেস্টে তিন হাজার রান পূর্ণ করেন। আগের তিনজন হলেন উমরিগর, মঞ্জরেকর ও বোরদে। গাভাসকর ও মহীন্দর জুড়ি দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেটে ১৯৩ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে-কোন ভারতীয় উইকেট জুড়ির চেয়ে বেশি রান করে নতুন রেকর্ড করেন। বোলিংয়ে সব থেকে কৃতিত্ব দেখান অধিনায়ক বেদী। দুই ইনিংসে ১০টি উইকেট। একটি টেস্টে বেদীর সব থেকে বেশি উইকেট প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সব থেকে বেশি কৃতিত্ব ৪১ বছর বয়সের অধিনায়ক সিম্পসনের। প্রথম ইনিংসে দলের

সিম্পসন। বুড়ো হাড়ে ভেল্কি খেলে

অধিকাংশ ব্যাটসম্যানের ব্যর্থতার মধ্যে তাঁর ১৭৬ রান ভোলার নয়। এ ছাড়া ভারতের প্রথম ইনিংসে বেঙ্কটরাঘবনের ক্যাচ ধরার সঙ্গে সঙ্গে টেস্টে সিম্পসনের শত ক্যাচ পূর্ণ হয়। সিম্পসনের আগে বিশ্বে মাত্র চারজন খেলোয়াড় এই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের কলিন কাউড্রে (১২০), ও ওয়ালি হ্যামণ্ড (১১০) অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান চ্যাপেল (১০৩) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স (১১০)।

সিম্পসনের কৃতিত্বের পর নাম করতে হয় টনি ম্যানের। বোলার হিসাবেই দলে স্থান পেয়েছেন। চতুর্থ দিনের শেষে 'নাইট ওয়াচম্যান' হিসাবে ব্যাট করতে আসেন। কিন্তু অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সব থেকে বেশি ১০৫ রান করেন। ম্যানের জীবনে দ্বিতীয় টেস্ট এবং দ্বিতীয় শতরান।

মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে ভারত প্রথম ইনিংসে ২৫৬ রান তোলে। মহীন্দর (৭২) বিশ্বনাথ (৫৯) এবং অশোক (৪৪) ছাড়া কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামে। চন্দ্রশেখর অসাধারণ বোলিং করে সওয়া চার ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের যবনিকা ফেলে দেন ২১৩ রানে। ৫২ রানে চন্দ্রশেখর পান ৬ উইকেট। প্রথম উইকেটটি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে টেস্টে তাঁর ২০০ উইকেট লাভ সম্পূর্ণ হয়। বেদী ছাড়া ভারতের কোনো বোলারের এই কৃতিত্ব নেই।

তৃতীয় দিনে গাভাসকর সেঞ্চুরি করেন। পর পর তিনটি টেস্টে তিনটি শতরান। কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের নেই। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, প্রথম টেস্টে ১১৩ এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১২৭ রান করেছিলেন তিনি। দুবারই দ্বিতীয় ইনিংসে। এ ছাড়া আর একটা মজার ব্যাপার, তিনটি টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি খুবই কম রান করেন ৩, ৪ ও ০। গাভাসকর আউট হন ১১৮ রান করে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩৪৩ রানে। অর্থাৎ মোট ৩৮৬ রানে এগিয়ে থাকে ভারত।

৩৮৭ রান করলে জয়, এই অবস্থায় ব্যাটিং আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়া। আবার চন্দ্রশেখর মারাত্মক হয়ে ওঠেন। ব্যাটস-ম্যানেরা আউট হতে থাকেন একে-একে। চৈত্রের ঝরা পাতার মত ঝরে পড়তে থাকে উইকেট। ৩২ রানে চন্দ্রশেখরের ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে ১২৩। পরাজয় নিশ্চিত। পঞ্চম দিন সকালে ৩৯ মিনিটেই খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ১৬৪ রানে শেষ। ভারতের জয় ২২২ রানে। চন্দ্রশেখর

বেদী। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট বিজয়ী অধিনায়ক

দুই ইনিংসে পান ১২টি উইকেট।

তৃতীয় টেস্টে ভারতের জয়ের জন্য চন্দ্রশেখর এবং গাভাসকরের বিশেষ কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই। তবে দলের অন্য সকলেরও কম-বেশি কৃতিত্ব আছে বই কী। ক্রিকেট দলের খেলা। সমবেত চেষ্টাতেই সাফল্য আসে। তাই সকলেই অভিনন্দনের যোগ্য।

জয়ের পর জয়

শ্যামসুন্দর ঘোষ

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্রিকেট-টেস্ট জয়ের স্বাদ এই বছরই আমরা প্রথম পাই। কিন্তু মেলবোর্নে যখন আমরা ২২২ রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারাই, তখনও আমরা জানতাম না যে, আরও বড় ও আরও চমকপ্রদ জয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেই জয় এল সিডনিতে। সেখানে আমরা ইনিংস ও দুই রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছি।

ভারতীয় ক্রিকেটে যা কিছু কৃতিত্ব, তা গত সাত বছরের, আর সেই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে ভারতীয় স্পিনারদের ক্রীড়াদক্ষতা। ১৯৭০ সালের আগে পর্যন্ত ভারত একমাত্র নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। ১৯৭১ সালে ভারত প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে। আর ঐ বছরেরই আগস্ট মাসে ইংল্যান্ডকে স্বদেশের মাটিতে হার স্বীকার করতে হয় ভারতের কাছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডকে পরাজিত করার ব্যাপারে ভারতীয় স্পিনাররা যেমন দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তেমনি এবারের সাফল্যের মূলেও রয়েছে সেই দক্ষতা।

অনেকে হয়ত বলবেন যে, অস্ট্রেলিয়ার সেরা খেলোয়াড়েরা তো আর এই খেলায় অংশ নেননি। তাঁরা থাকলে কি আর ভারতীয় স্পিনাররা এত ঝপাঝপ উইকেট ফেলে দিতে পারতেন? উত্তরে বলব, অস্ট্রেলিয়ার আঠারোজন খেলোয়াড় কেরি প্যাকারের দলে নাম লেখাবার ফলে এবারে অস্ট্রেলিয়া দলে অপেক্ষাকৃত তরুণ খেলোয়াড়েরা স্থান পান ঠিকই, কিন্তু এইসব তরুণ খেলোয়াড়ও যে স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ মিলেছে প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টে। প্রথম দুটি টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা মোটামুটি ভাল রান করলেও ভারতীয় স্পিন বোলাররা বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া যদি শেষ দুই উইকেটে ৮১ রান যোগ না করতে পারত, তাহলে প্রথম টেস্টে ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হত না। প্রথম টেস্টের মত দ্বিতীয় টেস্টেও মোটামুটি ভাল রান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়

প্রসন্ন

বিশ্বনাথ

স্পিনাররা সুবিধে করতে পারেননি। প্রথম দুটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার যে-খেলোয়াড়েরা বীরবিক্রমে ব্যাট চালিয়েছিলেন, তাঁদেরই আবার তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অসহায় মনে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের এই সাফল্য দুদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টেস্ট ক্রিকেটে বর্তমানে এই একটা ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে যে, নিজেদের খেলোয়াড়দের সুবিধের দিকে লক্ষ রেখেই পিচ তৈরি করা হয়। ভারতের মাটিতে যখন খেলা হয়, তখন ভারত স্পিন বোলিংয়ের সহায়ক উইকেট তৈরি করে। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা ইংল্যান্ডে উইকেট তৈরি করা হয় পেস বোলারের সুবিধের দিকে নজর রেখে। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতীয় স্পিন বোলারদের এই কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখ্য। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে প্রসন্নের ভূমিকা ছিল সত্যিই খুব মারাত্মক।

দ্বিতীয়ত বর্তমানে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রত্যেক দেশই নামমাত্র একজন স্পিন বোলার নিয়ে খেলতে নামে। ক্রিকেট থেকে স্পিন বোলিংয়ের অস্তিত্ব প্রায় মুছেই যাচ্ছে। অথচ পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে দল গঠনে পেস ও স্পিন বোলারদের সম-মর্যাদা লক্ষ করা যেত। ক্রিকেট যে শুধু গায়ের জোরের খেলা নয়, মাথার খেলাও বটে, বেদী চন্দ্রশেখর ও প্রসন্ন তা আরও একবার প্রমাণিত করলেন।

বাংলা বনাম গুজরাট। আকবর গোল দিচ্ছেন। জাতীয় ফুটবলের বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় পাবে।

মোহনবাগানের ত্রি-মুকুট

মুকুল দত্ত

একই বছরে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডুরান্ড কাপ জয় করে মোহনবাগান ক্লাব ফুটবলে ত্রি-মুকুটের অধিকারী হল। ফুটবলে ত্রি-মুকুটের জন্য এই তিনটি প্রতিযোগিতাই যে চিহ্নিত, সে-কথা তো আগের মাসেই বলেছি। মোহনবাগানের কৃতিত্ব, তাদের ত্রি-মুকুট জয়ে কোন খাদ নেই। ইস্টবেঙ্গলও ত্রি-মুকুট পেয়েছিল ১৯৭২ সালে। তবে তিনটি প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার জয়ে মোহনবাগানেরও ভাগ ছিল। রোভার্স কাপে দুই দল হয়েছিল যুগ্ম জয়ী। কিন্তু মোহনবাগান এবার একাই তিনটি বড় প্রতিযোগিতা জয় করে নিল, ভারতে কোন টিম এ পর্যন্ত যা পারেনি।

একে নিখুঁত একটি রেকর্ড বলতে পারো। ভারতীয় ফুটবলে সর্বপ্রথম রেকর্ড তো মোহনবাগানেরই, ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই এফ এ শীল্ড জয় করায়। এবারে এই নতুন রেকর্ডটিও লেখা হল তাদের নামের পাশে। তবে এ রেকর্ড হয়তো কোনদিন ভেঙে যাবে। কে ভাঙবে এবং কতদিন পরে ভাঙবে সেটাই প্রশ্ন। রেকর্ডটি কিন্তু মস্ত কৃতিত্বের। বুঝতেই পারছ, যদি সহজ হত, তবে এতকাল কোন দল কি করতে পারত না?

মোহনবাগানের আরও কৃতিত্ব ডুরান্ড ফাইনালে দুদিন তারা ০—১ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত জে সি টি মিল দলকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপ নিয়ে এসেছে। অবশ্য দুদিনই অনেক ভাল খেলে। পাঞ্জাবের ফাগোয়ারার জে সি টি মিল দলটি রীতিমত শক্তিশালী। আগের বছর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে যুগ্মভাবে ডুরান্ড কাপ পেয়েছিল। ফাইনাল খেলার আগে মোহনবাগান সেমিফাইনালে ৩—০ গোলে হারায় বাঙ্গালোরের আই টি আই দলকে, যে দলটি এ-বছরের গোড়ার দিকে মোহনবাগানকেই হারিয়ে ফেডারেশন কাপ জিতেছিল। অবশ্য আই এফ এ শীল্ডের খেলাতেও মোহনবাগান ৫—১ গোলে হারিয়েছিল আই টি আই-কে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ কীভাবে মোহনবাগানের খেলায় দিন-দিন উন্নতি হয়েছে। যে ইস্টবেঙ্গলের কাছে লীগের খেলায় হেরে গিয়েছিল, সেই ইস্টবেঙ্গলকেই শীল্ড ফাইনালে এবং রোভার্স কাপের সেমি ফাইনালে হারিয়েছে।

ডুরান্ডের সেমি ফাইনালেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা হত, যদি ইস্টবেঙ্গল নাম তুলে না নিত। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে ওই জে সি টি ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তখনো খেলার ১৫ মিনিট বাকি ছিল। জে সি টি পেনাল্টি কিক থেকে দ্বিতীয় গোলটি করে। ওই পেনাল্টি সম্পর্কে ইস্টবেঙ্গল রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে থাকে এবং গণ্ডগোলের ফলে শেষ ১৫ মিনিট আর খেলে না। তবু ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে আই টি আই-কে ২—০ গোলে এবং রোভার্স রানার্স টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ৫—১ গোলে হারিয়ে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ডুরান্ড কাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ায় আই টি আই সেমিফাইনাল খেলে মোহনবাগানের সঙ্গে।

কলকাতার দলগুলির মধ্যে এবার ডুরান্ডে আর খেলেছে জর্জ টেলিগ্রাফ ও ইস্টার্ন কম্যান্ড। দুটি দলই বেশ ভাল খেলেছে। জর্জ টেলিগ্রাফ ২—০ গোলে বিহার রেজিমেন্টকে, ৫—০ গোলে মাদ্রাজ ইনজিনিয়ারিং গ্রুপকে এবং ৩—২ গোলে পাঞ্জাব পুলিসকে হারিয়ে ১—৩ গোলে হেরে যায় টাটা স্পোর্টসের কাছে। আর ইস্টার্ন কম্যান্ড হারায় গোর্খা ব্রিগেডকে

ডুরান্ড ফাইনাল। ইন্দরের পায়ে বল; গৌতমও ছুটে আসছে

২—০ গোলে এবং বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন ওরকে মিল দলকে ২—১ গোলে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ থেকে সেমি ফাইনালে উঠতে পারে না তিনটি খেলাতেই মাত্র এক গোলের ব্যবধানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও মোহনবাগানের কাছে হেরে গিয়ে।

গত মাসে রোভার্স কাপের খেলার কথা লেখার সময় শ্যাম থাপার গোল করার হিসাব দিয়েছি। ডুরান্ডেও শ্যাম তিনটি গোল করে। ইস্টার্ন কম্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটির মধ্যে একটি, আই টি আইয়ের বিরুদ্ধে তিনটির মধ্যে একটি এবং প্রথম দিনের ফাইনালে জে সি টির গোলটি শ্যামই শোধ করে দিয়ে মোহনবাগানকে দ্বিতীয় দিন খেলার সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয় দিন জে সি টির প্রথম দেওয়া গোলটি শোধ করে দেয় সুভাষ ভৌমিক। আকবর করে জয়সূচক গোল। গোলটি ছিল এবারের ডুরান্ডে সবচেয়ে দেখার মত গোল।

মোহনবাগান ১২ বার ফাইনাল খেলে ডুরান্ড পেল ৭ বার। আর শুধু ত্রি-মুকুট জয়ই নয়, এক ডুরান্ডেই তো আছে তিনটি ট্রফি—ডুরান্ড কাপ, সিমলা ট্রফি আর রাষ্ট্রপতির ট্রফি। জানো বোধ হয়, ডুরান্ড কাপ ভারতের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা। সিমলাতে শুরু হয় ১৮৮৮ সালে। তখন এর সঙ্গে অন্য কোন ট্রফি ছিল না। ১৯৩৪-এ যোগ হয় সিমলা ট্রফি। ১৯৫০-এ দিল্লিতে খেলা শুরু হবার পর যোগ হয় রাষ্ট্রপতির ট্রফি।

হকির জাগলার

চিরঞ্জীব

'কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও চলে যেতে হবে। ও আমার ছোট, অথচ আমিই রইলাম। রূপ আমার সহোদর শুধু নয়, মাঠে ও মাঠের বাইরে ও ছিল আমার বন্ধু এবং সহযোগী।"

ত্রিশের দশকের দুর্ধর্ষ হকি খেলোয়াড় রূপ সিংয়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে ধ্যানচাঁদ ওই মন্তব্য করেন।

ধ্যানচাঁদ আর রূপ সিং—একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজন অসম্পূর্ণ। বিদেশীরা ধ্যানচাঁদকে বলতেন ক্লাসিক সেণ্টার ফরওয়ার্ড। বলতেন, উনি হকির জাদুকর—'উইজার্ড'। রূপ সিং সম্পর্কেও ছিল একই কথা। ওঁকে বলা হত ক্লাসিক লেফট-ইন। রূপকেও জাদুকর বলা হত, তবে ওঁর সম্পর্কে ইংরেজি শব্দটি ছিল 'জাগলার'।

ধ্যানচাঁদের মতই নানান গুণের জন্য রূপ সিংকে 'জাগলার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। যেমন ছিল তাঁর স্টিকের চাতুরী, তেমনি স্পীড, এবং অদ্ভুতভাবে শরীরটা বাঁকিয়ে বিপক্ষের গোলের দিকে ধেয়ে যেতেন। কোনো সময়ে দেখা গেছে, ছোট ভাই রূপ দাদা ধ্যানকেও ছাড়িয়ে গেছেন নৈপুণ্যে।

ঊনসত্তর বছর বয়সে রূপ সিং চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হল হকি কিংবদন্তীর একটি অধ্যায়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলে যেমন পেলে, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যান, ঠিক তেমনি হকিতে ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিং। অসাধারণ নৈপুণ্য দ্বারা এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহীয়ান। কিন্তু প্রত্যেকের সাফল্য

দুই ভাই। (বাঁয়ে) রূপ সিং, (ডাইনে) ধ্যানচাঁদ

এতই গৌরবময় যে, এঁদের ঘিরে প্রত্যেকের জীবদ্দশায় নানা গল্প, কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। রূপ সিংয়ের হকি স্টিক থাকত মন্ত্রপূত—এমন কথা শোনা গেছে।

১৯৩২-এ লস এঞ্জেলিস অলিম্পিক গেমসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ২৪—১ গোলে জেতে। ওই খেলায় সর্বাধিক গোল দেন রূপ, ১০টি। এটি আজও বিশ্ব রেকর্ড। ওর পরই রূপ সিংয়ের স্টিক নিয়ে নানা কাহিনী শোনা যায়। তখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়নি, তা না হলে এখন চীনা টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের ব্যাট নিয়ে যেমন সন্দেহ করা হয়—নিশ্চয়ই কোন যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে, তেমনি রূপ বা ধ্যানের স্টিককেও হয়তো সন্দেহের বশে পরীক্ষা করা হত।

ধ্যান-রূপের পর আমাদের দেশে কৃতী হকি খেলোয়াড় কম নেই। কিন্তু ভারতীয় হকির কথা উঠলে এঁদের দুজনকেই পৃথিবীর সব দেশ স্মরণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে। ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকসের সময় অলিম্পিক গ্রামের একটি রাস্তাও হয়েছিল রূপ সিংয়ের নামে।

১৯৩২-এ লস এঞ্জেলিস ও ১৯৩৬-এ বার্লিন অলিম্পিকসে ভারতের সোনা জয় এবং নানা খেলায় দুই ভাইয়ের কৃতিত্বের প্রশংসা কখনও রূপকে গর্বিত করেনি। কিন্তু একালের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করতেন, "এখন এত বিজ্ঞানভিত্তিক কোচিং, ছেলেদের এত সুযোগ, তবুও ওরা পারছে না।" আবার নিজেই উত্তর দিতেন, "পারবে কেমন করে! এদের অনেকের মধ্যেই নিষ্ঠার অভাব। অভাব ডিসিপ্লিনের, এরা কম পরিশ্রমীও।"

ঝাঁসির সোমেশ্বর দত্তসিংয়ের তিন ছেলের বড় মূল, মেজ ধ্যান ও ছোট রূপ। পিতৃসূত্রেই এঁরা হকি খেলা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ধ্যান-রূপের ছেলেরাও তাই। সব খেলাকে ভালবাসলেও হকির প্রতি রূপের ভালবাসার তুলনা ছিল না। ১৯৭১-এ ওঁর ছেলে ভগত আর দুই ভাইপো রাজকুমার ও অশোককুমার যখন কলকাতায় এসে মোহনবাগানে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সকলের আগে রূপ সিং তাতে সম্মতি দেন।

অশোককুমার কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হল। রূপের বড় সাধ ছিল ভাইপোর খেলা দেখার। দেখেছিলেনও। খেলার শেষে অশোক কাকার কাছে গিয়ে শুধিয়েছে বারে বারে, "পছন্দ হয়েছে আমার খেলা?" ভাইপোকে কিন্তু যতই স্নেহ করুন, রূপের ঠোঁট দিয়ে কখনও উচ্চারিত হয়নি, বা! বহুত আচ্ছা। কখনও বলেননি, দাদার কিছু গুণ তুমি পেয়েছ।

আসলে আরেকজন ধ্যানচাঁদ, আরেকজন রূপ সিংকে আমরা কখনও পাব না।

ষোল বছরের চ্যাম্পিয়ন

সুব্রত সরকার

সতের বছর পূর্ণ হতে এখনও মাস চারেক বাকি। মার্চে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় বসবে। ইচ্ছে আছে, পরে ওখানকার বিবেকানন্দ কলেজেই অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি এ পড়বে। তবে লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল হলেও শেষ পর্যন্ত তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স শেষ করতে পারবে কি না তা নির্ভর করছে তার এক্সট্রা-কারিকিউলার অ্যাক্টিভিটির উপর। কারণ, ছেলেটির নাম রমেশ কৃষ্ণন, বয়স অল্প হলেও আজ সে ভারতের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

তামিল প্রথা অনুসারে তার নাম অবশ্য হওয়া উচিত কৃষ্ণন রমেশ—প্রথমে বাপের নাম, পরে নিজের। তবে তার বাবা, টি রামনাথনের ছেলে রামনাথন কৃষ্ণন, আজকালকার কায়দাতে "কৃষ্ণন-"কে পরিবারের পদবির মতন করে দিয়েছেন। ফলে অনেক ইংরেজি পত্রিকার পাঠকের কাছে রমেশও হচ্ছে 'কৃষ্ণন' বাবার সঙ্গে যাতে তার নামটা গুলিয়ে না যায় তাই অনেক সময়েই তাকে বলা হয় 'ছোট কৃষ্ণন'।

নামকরা লোকেদের ছেলেরা যদি বাবার মতন একই ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করার চেষ্টা করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে তার বাবার সঙ্গে তুলনা করে। রমেশ যখন গত ডিসেম্বরে কলকাতার সাউথ ক্লাবে যশজিৎ সিংকে হারিয়ে ষোল বছর বয়সে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হল, তখন অনেকেই বলতে লাগলেন ঃ ছেলেটি ঠিক তার বাবার মতন খেলে। তবে তাঁদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই কৃষ্ণনের ষোল বছর বয়সের খেলা দেখেছেন।

রমেশ বাপের মতন ষোল বছর বয়সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলেও এটা মনে রাখা দরকার, কলকাতায় গত ন্যাশনাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়-আনন্দ-অশোক-অমৃতরাজ কেউই খেলেননি, খেলেননি শশী মেননও। তাঁরা নামলে রমেশের পক্ষে বিজয়ী হওয়া হয়ত সম্ভব হত না। তবে চব্বিশ বছর আগে কৃষ্ণন—রামনাথন কৃষ্ণন—যখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস জেতেন, তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে সুইডেনের ডেভিস কাপ রিজার্ভ খেলোয়াড় স্টেফান স্টকেনবার্গ, সেমি-ফাইনালে ১৯৫২-৫৩-র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন সুমন্ত মিশ্র আর শেষ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক আর্কিনস্টলকে হারান। সেইসময় তিনি নিঃসন্দেহে নিজেকে দেশের পয়লা নম্বর প্লেয়ার হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন।

কৃষ্ণনও ছেলের মতন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কিছুদিন আগেই প্রথম ডেভিস কাপ খেলেছিলেন। তবে বাপ-বেটা কেউই ভারতের কনিষ্ঠতম ডেভিস কাপ প্রতিনিধি নয় ঃ বিজয় অমৃতরাজ ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম নামেন ষোল বছর তিন মাস বয়সে আর দাদা আনন্দ অমৃতরাজ প্রথম খেলেন ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে—যখন তাঁর ষোল বছর পূর্ণ হয়ে মাত্র এক মাস হয়েছে। ডেভিস কাপের ইতিহাসে ষোল পূর্ণ হবার আগে খেলেছেন এমন প্লেয়ার খুবই কম ঃ পাকিস্তানের হারুন রহিম আর বর্তমান উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বরুন বর্গ সেই দলে পড়েন।

রমেশের কথায় ফেরা যাক। প্রথম যখন তার খেলা দেখি, চার বছর আগে পুনায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের সময়, তখন তার বয়স মাত্র বারো বছর সাত মাস। কোর্টের বাইরে তাকে দেখে মোটেই টেনিস প্লেয়ার বলে মনে হয়নি। গড়ন বেশ মোটাসোটা, চোখ একটু বেশি পিটপিট করে, আর মুখে সারাক্ষণ হাসি। যদি তাকে কৃষ্ণনের ছেলে বলে না চিনতাম তাহলে হয়ত মনে হত, বাপ-মায়ের কোনো আদুরে দুলাল, শখ করে তাঁরা টেনিস খেলাচ্ছেন ছেলেটাকে। তবে টেনিস কোর্টে নামলেই রমেশের অন্য রূপ। খুব একটা ঘোরাফেরা না করলেও তার বয়সী ছেলের পক্ষে তার গ্রাউন্ড স্ট্রোক ছিল চমৎকার—ফোরহ্যান্ডে আর ব্যাকহ্যান্ডে—আর তার প্লেসিং ছিল সূক্ষ্ম এবং যথাযথ। খেলায় বেশ বুদ্ধির পরিচয়ও দেখিয়েছিল। তিন-চারবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নেটে টেনে নিয়ে এসে তার উপর দিয়ে বেসলাইনবরাবর আক্রমণাত্মক কায়দায় বল লব করে পয়েন্ট জিতেছিল।

সেবার রমেশ সাব-জুনিয়র সিঙ্গলস জেতে—চোদ্দ বা তার নিম্নবয়স্ক ছেলেদের খেলায়। তারপর থেকে রমেশ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে—১৯৭৬ সালে প্রথম বিদেশ সফরে যায়, আর সেই বছরের শেষের দিকেই ন্যাশনাল জুনিয়র খেতাবই নয়, অল-ইন্ডিয়া হার্ড-কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপও জেতে। গত বছর বিদেশে গিয়ে প্রথম জুনিয়র উইম্বলডন খেলে, তারপর আগস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার-সিক্সটিন ন্যাশনাল জেতে। আর বছর শেষ হওয়ার আগেই সে খালি ডেভিস কাপ প্লেয়ার নয়, একই সঙ্গে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় (সিনিয়র) চ্যাম্পিয়ন আর অল-ইন্ডিয়া হার্ড-কোর্ট চ্যাম্পিয়ন।

কলকাতায় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করার আগে প্রায় ছয় মাস রমেশ ঘাসের কোর্টে একেবারেই খেলেনি। সেই দিক থেকে তার এই জয় খুবই কৃতিত্বের। তবে সে বি এ কোর্স শেষ করতে পারবে কি? আন্তর্জাতিক টেনিস খেলা তো এখন পুরোপুরি পেশাদারি ব্যাপার। আর আঠার থেকে কুড়ি বছর বয়স একজন সম্ভাব্য পেশাদার প্লেয়ারের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়—কারণ সেই সময়েই সে বিশ্ব সার্কিটে খেলে আন্দাজ করে নিতে পারে যে, পেশাদারি টেনিসে পুরোদমে নেমে পড়লে সে সুবিধে করতে পারবে কি না! যারা মোটামুটি ভাল প্লেয়ার তারা দু বছরে যা আয় করে অধিকাংশ চাকুরেরা দশ বছরেও তা পারে না।

রমেশ কৃষ্ণনের চার বছর আগের ছবি দেখা হল। এই চার বছরে সে ঠিকমতনই প্রোগ্রেস করেছে। তবে চার বছর পরে সে কোথায় থাকবে? তখনও কি লোকে বলবে, ছেলেটি ঠিক তার বাবার মতনই খেলে? নাকি বলবে, রমেশ ভাল খেললেও তার বাবা অন্য ধাঁচের প্লেয়ার ছিলেন?

বাঘের খপ্পরে ভগবান

গঙ্গেশ বিশ্বাস

সন-তারিখ মনে নেই—অনেক দিন আগেকার কথা তো। একবার মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব দেখা দিল। মৈপিঠ হল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মধ্যে কুলতলি থানার একটি বড় গ্রাম। ডায়মণ্ডহারবার থেকে লঞ্চ আর বাসে চেপে যেতে হয় সেখানে। এই গ্রামের পূর্বে রয়েছে ঠাকুরান নদীর একটা ফ্যাঁকড়া—জোয়ারের সময় ফুলে উঠে বেশ চওড়া হয়, আবার ভাটার সময় শুকিয়ে গিয়ে সরু হয়ে পড়ে। তাছাড়া বর্ষা আর চোত-বোশেখের বাড়া-কমার ব্যাপার তো আছেই। নদীটার ঠিক পুবেই বৈঠাডাঙার রিজার্ভ ফরেস্ট। জঙ্গলটা যেমন গরান, বাণী, ক্যাড়া, সুন্দরী, গামা, হেঁতাল গাছে ভর্তি, সুন্দরবনী কেঁদো বাঘেও সেটা ছিল তেমনি ঠাসা। সুযোগ পেলেই রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণরায়ের এই বেয়াদব চেলারা কেউ কেউ ঠাকুরান পেরিয়ে চলে আসত মৈপিঠে, আর গরু-ছাগল-মানুষ, যখন যাকে পেত মুখে করে অনায়াসে নদী সাঁতরে আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে ভোজ লাগাত মহানন্দে। যারা সদলে বৈঠাডাঙা-জঙ্গলে যেত কাঠকুটো ভেঙে আনতে, তাদের মধ্যেও কেউ-কেউ প্রাণ দিত বাঘের হাতে। সেখানকার বাঘগুলো ছিল এমনি বেপরোয়া যে দিনের বেলাতেও কোনো কোনো কাঠুরেকে সরাসরি আক্রমণ করে বসত।

যে বছর মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব চলছিল, সেই বছরই ফাল্গুন মাসে ঐ গ্রাম থেকেই ভগবান, কাঙাল, নিতাই আর গোবরা—এই চারজন বৈঠাডাঙা জঙ্গলে গিয়েছিল কিছু কাঠ কেটে আনতে। গ্রাম থেকে জঙ্গল ছিল মাইল দেড়েক দূরে। একটা ডিঙিতে হাত-দা, দড়ি, কুড়ুল, মুড়ি আর ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে খাবার জল নিয়ে তারা যখন নদীর ওপারে জঙ্গলের ধারে পেঁছিল, বেলা তখন দশটা কি এগারোটা। নদীর ঠিক ধার থেকেই জঙ্গল শুরু। কিন্তু একেবারে বনের ধারে কাটার মত গাছ না পেয়ে ওরা একটা খালের মধ্য দিয়ে জোয়ার ধরে ডিঙিটাকে নিয়ে গেল বনের আরো সিকি মাইলটাক ভিতরে। বনের ভেতরটা ওদের মোটামুটি জানা ছিল। সেখানেই নেমে পড়ল তারা। খালের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা গামা গাছের সঙ্গে ডিঙিটা বেঁধে রেখে ওরা উঠে এল একটা ধলের মধ্যে। ধল হচ্ছে বনের ভেতরে বড়-বড় ফাঁকা জায়গা। কোনো ধলে বাণী-গরানের চারা ছড়িয়ে থাকে, আবার ফুটা-ধলে মানুষের টাক-মাথার মত কোনো গাছই থাকে না। ভগবানদের এই ধলে ছিল বাণী-গাছের চারা। সম্পূর্ণ ধলটার ওপরে জমে ছিল একটা পুরু নুনের স্তর। বড় কোটালের সময় খালের নোনা জলে ডুবে যায় ধলটা ; রোদের তাপে সেই জল শুকিয়ে গেলে ধলের মাটিতে ফুটে ওঠে গুঁড়ো গুঁড়ো নুন এই ভাবে বছরের পর বছর ধলে জমতে থাকে নুনের স্তর।

চোত-বোশেখের দুপুরে নুনের জন্য ধলের জমি এমন তেতে ওঠে যে, তার ওপর দিয়ে তখন খালি পায়ে মানুষের পক্ষে হেঁটে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ফাল্গুন মাস হলেও ধলের মাটি

বেশ তেতে গিয়েছে। ধলের ওপারে ছিল বড় জঙ্গল ; কিন্তু এপারেও ছিল মেলাই বাণী-গরান-সুঁদরি। ধলের এপারের জঙ্গলেই কাটার মত কয়েকটা গাছ ঠিক করে নিল তারা। গাছ বাছাই করতে গিয়ে তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ল একজন থেকে আর একজন। তাদের মধ্যে আবার ভগবানের গাছটাই ছিল একটু বেশি দূরে—সব রকম গাছের ভিড়ও ছিল সেখানেই বেশি। তাহলেও ডাক দিলে আর তিনজন শুনতে পায় কি-না, তা তারা আগে থেকেই কুই-ডাক ডেকে বুঝে নিল—বনের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কাঠুরে-শিকারী-মৌলিরা কেউ কারো নাম ধরে ডাকাডাকি করে না।

যারা কাঠ কাটে তাদের যেমন বলা হয় কাঠুরে, তেমনি যারা সুন্দরবনের মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে আসে তাদের বলা হয় মৌলি। ভগবান একটা গরান গাছ বেছে নিয়ে তাতে আট-দশটা কুড়ুলের কোপ বসাবার পরেই দেখতে পেল, তার সামনের দিকে প্রায় হাত পনেরো দূরে একটা কাঁটা ঝোপের ধারে মূর্তিমান যমের মত একটা বাঘ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে—বসে বসে মতলব আঁটছে কীভাবে তাকে আক্রমণ করবে। ভগবান গাছের পেছনে থাকায় জানোয়ারটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারছিল না। ভগবানেরও তখন কিছুই করার ছিল না। ছুটে পালাতে গেলে লাফিয়ে এসে বাঘ তার টুঁটি চেপে ধরবে। কুড়ুল বাগিয়ে সোজাসুজি বাঘটাকে চ্যালেঞ্জ জানানোও ছিল অসম্ভব, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়ুল সুদ্ধ তাকে ফেলে দেবে মাটিতে। তবে গাছে উঠে পড়তে পারলে যমটাকে ফাঁকি দিতে পারত ভগবান—এ-সব বাঘ গাছে উঠতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো আর হনুমান নয় যে, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে। গাছে উঠতে গেলেও বাঘটা ভগবানকে ধরে ফেলার সুযোগ পেয়ে যেত। তাই, মন্দের ভাল, বাঘটাকে দেখতে পেয়েই ভগবান গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল, যাতে জানোয়ারটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। কিন্তু নখ-ছাল-লোম শূন্য এমন কোমল নরমাংসের লোভ বেশিক্ষণ দমন করেও থাকতে পারল না বাঘটা। মিনিট খানেক ভগবানকে সেইভাবে লক্ষ করতে করতে এক সময় ছুটে এসে ভগবানের বাঁ-কাঁধের আর হাতের জোড়ের জায়গায় কামড়ে ধরল, আর সামনের দিকের ডান পায়ের থাবা বসিয়ে দিল ভগবানের পিঠের বাঁ-দিকে। দারুণ বিপদের মধ্যে পড়েও ভগবান হাল ছাড়ল না ; সেই অবস্থাতেই বাঁ-হাত দিয়ে শক্ত করে গরান গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে বাঘটার পিঠে যতটা সম্ভব জোরে কুড়ুলের কোপ মারতে লাগল একটার পর একটা। কিন্তু গাছকাটা কুড়ুল যে এক হাতে চালানো কেমন অসুবিধার কাজ, যে তেমন কুড়ুল হাতে নিয়েছে, সে তা সহজেই বুঝতে পারবে। ভগবানের অনেক জঙ্গলের অভিজ্ঞতা ছিল, অনেকবার এর-তার সঙ্গে শিকারেও গিয়েছে ; কিন্তু এরকম বিপদে পড়েনি কখনো। সে ঐ ভাবে বাঘের পিঠে ডান হাত দিয়ে কুড়ুলের কোপ বসাতে-বসাতেই চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই তোরা কোথায়, আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলল রে! মরে গেলাম, মেরে ফেলল, মেরে ফেলল!"

বাঘটা কিন্তু কুড়ুলের কোপ খেয়েও ভগবানকে ছাড়ছে না, কেবল গর-গর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। ভগবানের চিৎকার শুনে কাঙালরা তিনজনেই ছুটে এসে দেখে ভগবান আর বাঘের লড়াই চলছে। নিতাই আর গোবরা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল কাঠ হয়ে। কাঙাল সাহসী লোক। সেও ভগবানের সঙ্গে অনেক শিকারে গিয়েছে শিকারীদের সাহায্য করতে। সে ছুটে এসে দু-হাতে কুড়ুল তুলে বাঘটার মোটা ঘাড়ের ওপর মারল প্রচণ্ড এক কোপ ; কিন্তু কুড়ুলটা বাঘটার ঘাড়ের হাড়ে এমনভাবে বসে গেল যে কাঙাল সেটা আর তুলতেই পারল না সেখান থেকে। কাঙালের সেই অবস্থা দেখে নিতাই এবার এগিয়ে এসে কাঙালের কুড়ুলের পাশে বসিয়ে দিল আর এক কোপ। ফলে কাঙালের কুড়ুলটা গেল খুলে—দু-জন মজুরে মিলে কাঠ চেরাইয়ের সময় যেভাবে কুড়ুল বসায় আর ওঠায়, ঠিক সেই রকম আর কি। বাঘটা তখনো দাঁত বসিয়েই রেখেছে ভগবানের কাঁধে—আশ্চর্য তার জেদ আর লোভ। বাঘটা ভগবানকে কামড়ে ধরার পর থেকেই গোঁ-গোঁ করে গজরাচ্ছিল। কাঙালের এক কোপ খেয়েও তার গজরানি থামেনি। কিন্তু নিতাইয়ের কোপ পড়তেই বন্ধ হল তার গজরানি। ভগবান তখন নিজের আর বাঘের রক্তে স্নান করছে। পর পর তিন-চারটে কুড়ুলের কোপ পড়তে বাঘের গলা যখন দু-ফাঁক হতে আর অল্পই বাকি, ভগবান আর বাঘ, দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। ভগবানের আর তখন জ্ঞান নেই।

কাঠ কাটা পড়ে থাকল। তাড়াতাড়ি ভগবানকে ধরাধরি করে ডিঙিতে এনে তুলল কাঙালরা তিনজনে। কোনরকমে বাঘটাকে তোলা হল ডিঙিতে। পরে দেখা গেল, সেটা বাঘ নয়, বাঘিনী ; তাই বোধ হয় তার তেজ ছিল ঐ রকম সাংঘাতিক! ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে যাওয়া হল মহকুমা শহরে, সেখান থেকে আবার কলকাতায়।

মাসখানেক বাদে ভগবান ফিরে এল গ্রামে। তার বাঁ-হাতটা কেটে বাদ দিতে দিতেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়েছে। কিন্তু হাতটা টিকে গেলেও সেটা প্রায় বিকল হয়েই রইল।

শুধু ভগবান নামটার জন্যই বোধ হয় একটা ভয়াবহ বাঘের খপ্পরে পড়ে গিয়েও সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল ভগবান।

ছবি বিমল দাশ

শকুনের পালক পার্থ চট্টোপাধ্যায়

যে-কোনো কারণে হোক, জায়গাটার নাম বলতে পারছি না। তবে বেশি দিন আগের কথা নয়। গত ইলেকশনের সময় খবর জোগাড় করতে বেরিয়ে পশ্চিমবাংলার কোনো একটি রেল স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম তার ভয়াল স্মৃতি আজও আমার মন থেকে মুছে যায়নি।

প্রচণ্ড গরম তখন। গ্রীষ্মের দাবদাহে রুক্ষ বন্ধুর এই অঞ্চলটি সারাদিন ধরে একটি ক্লান্ত ভারবাহী পশুর মত হাঁফাতে থাকে। সূর্য ডুবে গেলে একটু একটু করে স্বাভাবিক জীবন যেন ফিরে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামে রাতের জীবনের আয়ু অতি সামান্য। আটটা না বাজতেই সব কিছু নিঝুম হয়ে পড়ে।

কাজেই আটটার মধ্যে কাজকর্ম হয়ে গেল। শুনলাম রাত নটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে চাপলে ভোরবেলা কলকাতা পৌঁছতে পারব। মাইল দশেক দূরে জংশন স্টেশন। ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বললাম, জোর গাড়ি ছোটাতে। কিন্তু মফস্বলের ট্যাক্সি। খানিকটা গিয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বনেট খুলে টর্চ জেবলে ইনজিনের গোলযোগ দূর করে গাড়ি আবার চলল বটে, কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন ছেড়ে গেছে।

স্টেশনের টিকিটবাবু বললেন, "কলকাতার ট্রেন আবার ভোর ছ'টায়। আপনি রিটায়ারিং রুমে গিয়ে রাত্তিরটা কাটাতে পারেন।"

ওভারব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে আপ প্লাটফর্মের দোতলায় রিটায়ারিং রুম খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। হিন্দি ও বাংলায় লেখা আছে—আরাম কক্ষ। কিন্তু বারান্দায় কোন আলো নেই। শুধু পিছনের রাস্তার আলোর কিছুটা ছটা এসে পড়েছে। বারান্দা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তাঘাট নির্জন। দু-একটা রিকশা-ওয়ালা বসে ঝিমোচ্ছে। একটা বাস এইমাত্র ছেড়ে গেল। প্রচণ্ড ভিড়। বোধ হয় লাস্ট বাস।

বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে হেঁটে যেতেই শুনতে পেলাম পিছন দিকে ঠক ঠক করে একটা শব্দ এগিয়ে আসছে। চমকে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি বছর ত্রিশেক বয়সের এক যুবক। গায়ে রেলের বেগুনি রঙের হাফ শার্ট। একমুখ দাড়ি। আর একটা পা হাঁটুর দিক থেকে কাটা। ক্রাচে ভর করে সে দ্রুতগতিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি কিছু বলতে যাবার আগে লোকটি বলল, "রিটায়ারিং রুমে যাবেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। তুমি?"

"আমি রিটায়ারিং রুমের আরদালি।"

আমি তার দিকে রেলের রসিদটা এগিয়ে ধরলাম।

লোকটি কোনো কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। তারপর বলল, "ঘরে আলো নেই স্যার। স্টকে বাল্‌ব নেই কাল থেকে। অর্ডার গেছে, এখনও আসেনি।"

আমি অপ্রসন্ন হয়ে বললাম, "তাহলে রাতে থাকব কীভাবে?"

"আমি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখব। বাল্‌ব থাকলেও সুবিধে হত না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোডশেডিং এখানে।"

লোকটি ক্ষিপ্র হাতে একটি হ্যারিকেন বার করে পলতেতে আগুন ধরাল। সেই আলোয় ঘরের দিকে তাকিয়ে আমার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম, দুটো বেড থাকবে—কিন্তু ঘরে চারটি বিছানা।

"আর ঘর নেই?"

"না। এই একটাই রুম আমাদের।"

"তোমার নাম কী?"

"লখাই বিশ্বাস। লাখু বলে সবাই ডাকে।"

লাখু আর কোনো কথা না বলে স্টিলের আলমারি খুলে তোয়ালে আর বিছানার চাদর বার করল। তারপর নিপুণ হাতে বিছানা করে আমাকে বলল, "খুব মশা আছে। মশারিটা টাঙিয়ে নেবেন। আপনি খেয়ে এসেছেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"তাহলে কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেব। যখন দরকার ডাকবেন। আমি বারান্দাতেই ঘুমোই।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন? তালা দেবে কেন?"

"আপনারই সুবিধের জন্য। ইস্টিশনটা সুবিধের নয়। অনেক উটকো প্যাসেঞ্জার রাতে এসে জুটতে পারে। টিকিট থাকলে কাউকে তো আর ফেরানো যায় না। এই তো কিছুদিন আগে দুজন প্যাসেঞ্জার এলেন। কেউ কাউকে চিনতেন না। একটুতেই দুজনের মধ্যে খাতির জমে গেল। রাত বারোটা পর্যন্ত দুজনে কী গল্প। তারপর ভোরবেলা এক প্যাসেঞ্জার চলে গেলেন। আর একজন গভীর ঘুমে অচেতন। ঘুম ভেঙে তিনি দেখেন, তাঁর মানিব্যাগ ঘড়ি মায় সুটকেসটি পর্যন্ত উধাও। সেই থেকে মাস্টার-মশাই বলেছেন : "লাখু, রাতে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখবি। যখন কেউ ডাকবে খুলে দিবি।"

তবুও লাখু একটু ভরসার কথা শোনাল। নইলে আমারও একটু ভয় হয়েছিল বইকি। কিন্তু আমার ঘুম এত তাড়াতাড়ি আসে না। সঙ্গে বই আছে, আলো নেই।

লাখু লোকটাকে ইনটারেস্টিং মনে হল। ওর সঙ্গে গল্প করে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে চাইলাম।

লাখু সম্পর্কে জানলাম, ছেলেটির বাড়ি মেদিনীপুরের দিকে। রেলে বছর দশেক কাজ করছে। বিয়ে থা করেনি। রেল কোয়ার্টার্সে থাকে। পাশের বাড়িতে খায়। আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "লাখু, তোমার অ্যাকসিডেন্টটা হল কী করে?"

লাখু এই কথা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, আপনি তুক-তাকে বিশ্বাস করেন?"

আমি বললাম, "অনেক অলৌকিক ঘটনা কিছু কিছু দেখেছি। কিন্তু সেগুলির পিছনে যে কোনো কার্যকারণ নেই তা বলতে পারব না। তুকতাক ঝাড়ফুঁক তার মধ্যে একটা হতে পারে। ছোটবেলায় একবার আমায় কুকুরে কামড়েছিল। আমি দেখেছিলাম, এক গুনিন আমার পিঠে মন্ত্রপূত একটি থালা এঁটে দিলেন। থালাটিও পিঠে আঠার মত লেগে রইল। এ নিয়ে অবশ্য আমি মাথা ঘামাইনি।"

লাখু বলল, "তুকতাকের জোর আছে স্যার, একসময় আমি এই সব নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলাম। আমাকে এই কাজে মাতিয়ে তুলেছিল একটি কালো শকুনের পালক।"

"কালো শকুনের পালক?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

লাখু বলল : "হ্যাঁ স্যার, এসব কথা কাউকে কোনদিন বলিনি। আপনি খবরের কাগজে লেখেন, আপনাকে পেয়ে বলছি।

"বছর দুয়েক আগে এখান থেকে বেশ দূরে একটি মেলা থেকে ফিরছি। তিন মাইল মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটা পথ। হাঁটতে হাঁটতে ধান-খেতের আলের ধারে দেখি, কুচকুচে কালো রঙের একটি বিরাট পালক পড়ে রয়েছে। প্রথমে মনে হল, কাকের পালক। কিন্তু কাকের পালক তো এত বড় হয় না। আর তাছাড়া তার আগাটাও কলমের মত এত মোটা নয়। পালকটাকে আমি সাবধানে হাতে তুললাম। কিন্তু ধরতেই গা-টা যেন কেমন শির-শির করে উঠল।

"পালকটাকে আমি বাড়িতে এনে দরজার মাথায় তুলে রেখে দিলাম। কিন্তু ওটা কীসের পালক সেটা জানবার জন্য আমার মন খুব ছটফট করতে লাগল। আমাদের স্টেশনের ধারে গাছতলায় একটি লোক মাঝে মাঝে এসে নানান পাখির হাড় আর লতাপাতা শিকড় বিক্রি করে। কিছুদিন পরে লোকটিকে দেখে তাকে চুপি-চুপি পালকটা দেখালাম।

"পালকটি দেখে লোকটির মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। যেন সে ভয়ানক অবাক হয়ে গেছে। আমাকে বলল, পালকটি কোথায় পেলে? আমি বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছি। লোকটি বলল, পালকটি আমায় দিয়ে দাও। তোমায় দশটা টাকা দিচ্ছি।

"আমি বুঝলাম এটি খুব দামী। বললাম, বিক্রি করব না।

"'তোমায় বিশ টাকা দেব।'

"'একশ টাকা দিলেও দেব না।'

"লোকটা দুশ টাকা পর্যন্ত দর দিয়েছিল। আমি রাজি না হতে বলেছিল, বেশ, তুমি যদি নেহাতই ওটা হাতছাড়া করতে না চাও তাহলে তোমায় আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তুমি রাজি থাক তো বলো।

"'কী প্রস্তাব?'

"'তোমার হাতে যে পালকটা রয়েছে এটা এক দুর্মূল্য জিনিস। কালো শকুনের পালক। শকুনের রঙ ঈষৎ লালচে। কিন্তু এক ধরনের কালো শকুন আছে যারা গহন অরণ্যের মধ্যে থাকে। কদাচিৎ লোকালয়ে আসে। সেই শকুনের ঝরা পালক অমাবস্যার দিন মহাশ্মশানে কোনো মৃতদেহের ওপর সাতবার বুলিয়ে ডাকিনীমন্ত্র পাঠ করলে এই পালক জাগ্রত রক্ষাকবচের মত কাজ করে। তার কাছে কোন শত্রু ঘেঁষতে সাহস করে না। এমন কী প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সে শত্রুর বিনাশ কামনা করলে শত্রুর মৃত্যুও ঘনিয়ে আসে। ডাকিনী তন্ত্রসার বইতে তাই কালো শকুনের পালককে বলা হয়েছে 'মৃত্যুশলাকা'। এখন তুমি যদি আমাকে পাঁচশ টাকা দাও তাহলে তোমার শকুনের পালক আমি মন্ত্রপূত করে দিতে পারি।'

"আমি শিউরে উঠলাম। ওঃ কী মহামূল্য বস্তু আমাকে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন! আমি রাজি হয়ে গেলাম।

"তারপর তক্কে তক্কে থেকে এক অমাবস্যার রাতে সেই সুযোগ এসে গেল। পাশের গ্রামে একজন মারা গেছে। শ্মশানের ডোমকে পাঁচটা টাকা বকশিস দিয়ে শকুনের পালক মড়ার দেহে সাতবার ছোঁয়াবার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমরা দুজনে লুকিয়ে রইলাম পাশে এক জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে তন্ত্র সাধনার সব ব্যবস্থা তৈরি ছিল। লোকটির পরনে পট্টবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদুর, সামনে রাখা মড়ার খুলি। পুজোর অন্যান্য উপচার। সেই অন্ধকার রাত্রিতে শুধু একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সারারাত ধরে চলল তন্ত্র মন্ত্র। তারপর মন্ত্রপূত শকুনের পালকটি আমার হাতে লোকটি যখন তুলে দিল তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে। তুলে দিয়ে বলল, তোমার হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ তুলে দিলাম। কিন্তু সাবধান, এর যদি কোনো অপপ্রয়োগ হয় তাহলে তোমার নিজের সর্বনাশ অনিবার্য। তারপর পালকটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এবার টাকাটি দাও।

"আমি গুনে গুনে দুশো টাকা দিলাম।

"'আর টাকা কোথায়?'

"'পালকটি আমি মুঠো করে শক্ত করে ধরে বললাম, আর টাকা

নেই। তাছাড়া পালকের গুণাগুণ পরীক্ষা না করে আমি আর টাকা দেব না।

"'দেবে না?'

না। বলে আমি প্রবল জোরে ছুট লাগালাম।

"কিন্তু ওই পালকই আমার কাল হল। পালকটিকে আমি দু ভাঁজ করে ভেঙে সব সময় নিজের কাছে রেখে দিতাম। কিন্তু তারপর থেকেই আমার রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। অনেক আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। মনে হত, কবে দিন আসবে যেদিন পালকের শক্তি পরখ করত পারব। লোকটিকে তারপর থেকে দেখিনি। কিন্তু আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম।

"মাস দুয়েক পরে স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে। আমি ডিউটিতে রয়েছি। হঠাৎ দেখি, ভিড় ঠেলে লোকটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হঠাৎ কী করব ভেবে পেলাম না। মনে পড়ে গেল শকুনের পালকের কথা। পকেটের মধ্যেকার সেই পালক স্পর্শ করে আমি মনে মনে বিড়-বিড় করে বললাম, লোকটির যেন এখুনি অপঘাতে মৃত্যু হয়। তারপর মনে হল, আমি চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে ওঠার চেষ্টা করছি। আর হাতলটা হাত থেকে পিছলে সরে যেতেই আমি নীচে পড়ে গেছি। লোকজন হই-হই করে উঠছে। আর আমার জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন শুনলাম আমার একটা পা জন্মের মত চলে গেছে।

"হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম ছ মাস পরে। যখন ফিরে যাচ্ছি তখন হাসপাতালের নার্স এসে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে বলল, লাখু, তোমার পকেটের ভেতর এটা ছিল। মোড়ক খুলে দেখি শকুনের পালক। কম্পিত হাতে সেটি আমি নিলাম। আমার মাথায় তখন জেদ চেপে গেছে, আমি এর শেষ কোথায় দেখব। হ্যাঁ, আমি বিনা দোষে লোকটির ক্ষতি করতে চেয়েছিলাম, তাই হয়ত আমার এই সর্বনাশ হয়েছে, কিন্তু এখন থেকে আমি যদি সতর্ক হই তাহলে এই পালক আমার কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদও তো হতে পারে।

"ভেবেছিলাম, লোকটির দেখা পেলে তার টাকাটা মিটিয়ে দেব। কিন্তু তার দেখা পেলাম না। তবে তারপর থেকে দুবার বাড়িতে চোর ঢুকল। দু-দুবারই আমি বাড়ি ছিলাম না। চোর কোনো কিছু নেয়নি, শুধু জিনিসপত্র আতিপাতি করে কী খুঁজে গেছে।

"আমি জানি চোর কী খুঁজতে এসেছিল। কিন্তু আমি এমন জায়গায় তাকে রেখেছি, কেউ তা খুঁজে পাবে না।"

লাখুর গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। দারুণ জমাটি গল্প বলতে পারে লোকটি। শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কালো শকুনের পালক—যত সব বুজরুকি। তবে লোকটি বেশ ইনটারেস্টিং। ভোরে যাওয়ার আগে ওকে দু টাকা বখশিস দিয়ে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু তখন কে জানত গভীর রাতে আর এক ভয়ংকর বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি যেন এক মহাশ্মশানের ওপর দিয়ে হাঁটছি। চারদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল হাত বাড়িয়ে আমায় ধরতে আসছে। আমি পালাতে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে প্রবল ধাক্কা খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। চোখে পড়ল মশারির বাইরে ঠিক আমার শিয়রের সামনে এক ছায়ামূর্তি। আমার বালিশের তলাটা হাতড়াচ্ছে। আরে! এই বালিশের তলাতে আমি ঘড়ি আর মানিব্যাগ রেখে শুয়েছিলাম। আমি চকিতে উঠে লোকটিকে মশারি সমেত জাপটে ধরতে সে প্রবল শক্তিতে বিছানার মধ্যে আমায় ফেলে আমার গলা চেপে ধরল। আমার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে আসছে। আমি আর পারছি না। চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে উঠল আমার বাবা-মা-স্ত্রী ও ছেলের মুখ। হায়, আজ আমার জীবনের যে শেষ দিন তা কি কাল রাতেও বুঝতে পেরেছিলাম।

হঠাৎ আমার মধ্যে একটা ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে উঠল। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম। আমাকে আরও, আরও শক্তি দাও, যাতে আমার আততায়ীকে এই মুহূর্তে আমি বিনাশ করতে পারি। আমার শত্রু ধ্বংস হোক। সেই মুহূর্তে কে যেন আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দিল—দেহে, গলায়। এক ঝটকায় লোকটা ছিটকে পড়ল। আমি চিৎকার করে উঠলাম—বাঁচাও বাঁচাও।

সেই মুহূর্তে দ্রুত দরজার চাবি খোলার শব্দ।

লাখুর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

"কী হয়েছে স্যার—কী হয়েছে?"

আমার আততায়ী দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে ঘর থেকে ছুটে গেল।

লাখু তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন জ্বালাল। সারা ঘরে দক্ষযজ্ঞ ঘটে গেছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "লোকটা কে? ঘরে এল কী করে?"

লাখু বলল, "লোকটি একজন প্যাসেঞ্জার। দিব্যি ভদ্রলোকের মত চেহারা। আপনি ঘুমোবার পর এসেছিল। এই ভোরের ট্রেনে চলে যাবে কথা ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর যে এই মতলব ছিল তা কে জানত।"

লাখুর কথা শেষ হয়নি। নীচের প্ল্যাটফর্মে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ট্রেনটি ছাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ততক্ষণে আমরা দুজনে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি—যেখান থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়। দেখলাম, একটি লোক ছুটতে ছুটতে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গেল, কিন্তু ট্রেনটি ততক্ষণে স্পীড নিয়েছে। লোকটি হাতলটা ধরতে গিয়ে নাগাল পেল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একেবারে প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনের মাঝখানের জায়গায়। স্টেশনে চিৎকার উঠল—গেল গেল।

লাখু দ্রুতগতিতে নেমে গেল সমস্ত ব্যাপারটা দেখে আসতে। মিনিট পনের পরে ফিরে এসে বলল "স্যার, সেই লোকটি। যে কাল রাতে এই ঘরে বেড ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কালো শকুনের পালক আর একবার তাহলে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিল।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এর মধ্যে শকুনের পালক আসছে কোথা থেকে লাখু?"

লাখু কোনো কথা না বলে, আমি যে বিছানায় শুয়েছিলাম সেই বিছানা থেকে একটা মাথার বালিশ নিয়ে এসে তার সেলাইটা খুলে ফেলল। তারপর তুলোর ভেতর হাত ঢুকিয়ে কাগজে মোড়া একটি জিনিস আমার সামনে মেলে ধরল।

দুমড়েমুচড়ে যাওয়া একটি পাখির পালক। —বীভৎস দেখতে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না।

লাখু বলল, "বাড়িতে চোর হানা দেবার পর এতদিন ধরে পালকটাকে এখানে এভাবে লুকিয়ে রেখেছি। আচ্ছা স্যার, কাল রাতে আপনি কি প্রার্থনা করছিলেন, যে লোকটি আপনার গলা টিপে ধরেছে তার মৃত্যু হোক?"

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অনুতপ্ত খুনীর মত আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

লাখু চিৎকার করে উঠল, "এই শকুনের পালক আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, স্যার। বিনা অপরাধে শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়েছিলাম বলে আমি আমার পা হারিয়েছি, কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন বলে আপনি জীবন ফিরে পেলেন। আপনার প্রার্থনা শকুনের পালক শুনেছে স্যার।"

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, একটি রক্তাক্ত দেহকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এক অজানা আতঙ্কে চমকে উঠে আমি চোখ বুজলাম।

ছবি সুধীর মৈত্র

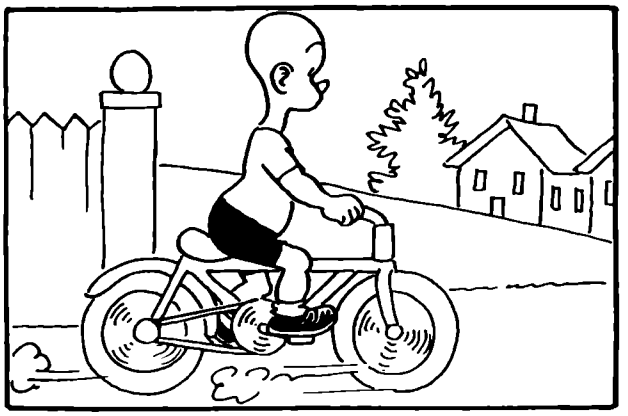

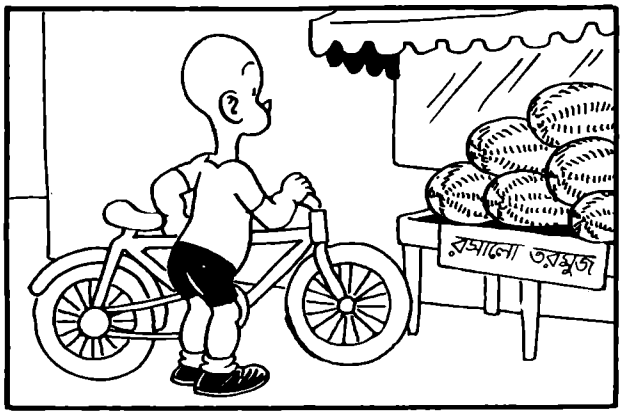
রসালো তরমুজ

রসালো তরমুজ

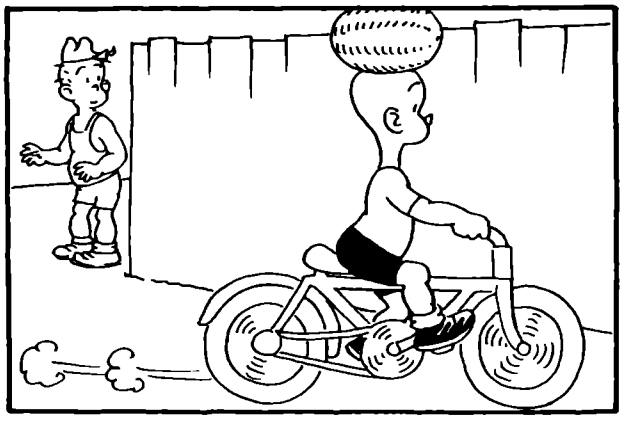

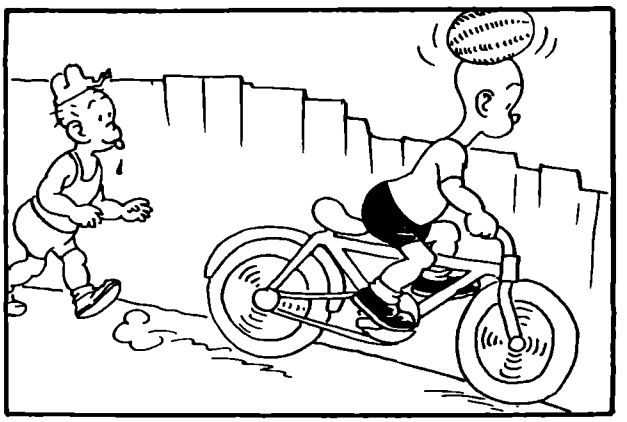

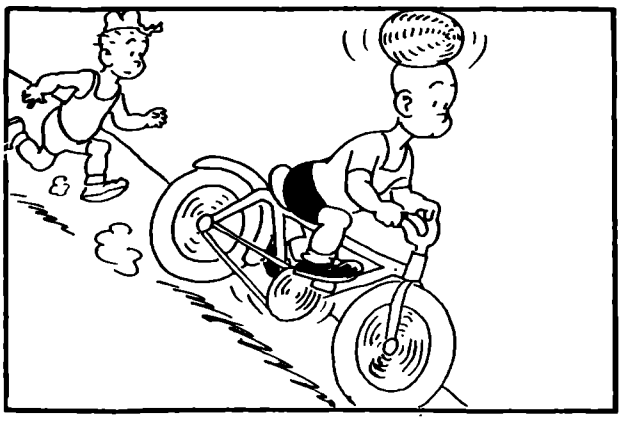

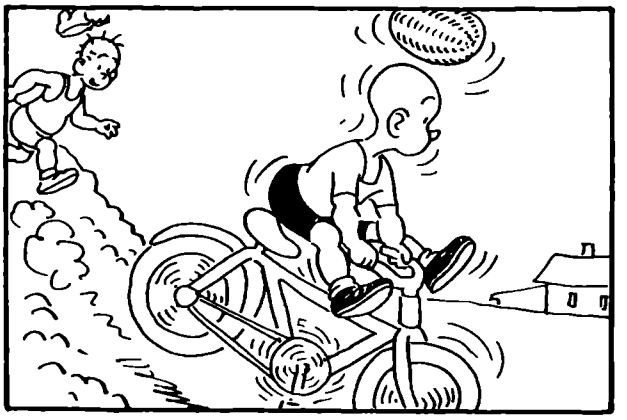

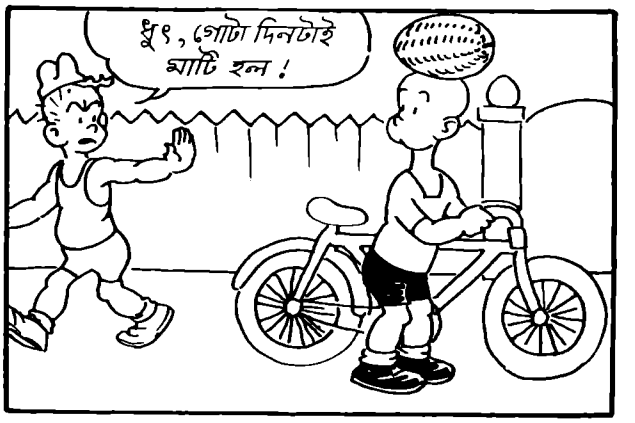
ধুৎ, গোটা দিনটাই
মাটি হল!

ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কু-ঝিক-ঝিক, কু-ঝিক-ঝিক,
রেলগাড়ি নয়। অন্য ম্যাজিক।
আছেন সে এক ঐন্দ্রজালিক
করেন না কো রেয়াত কারও।
খুব তো কথার ফিনিক ফোটাও,
রকেট-টকেট অনেক ছোটাও,
ক'জন জানো-ম্যাজিক আছে
এই আকাশ, এই সাগরটারও।

ম্যাজিক আছে বন-বাগিচায়
জোনাকির ঐ নীল আগুনে,
ম্যাজিক চলে অতল-তলে
মীন-মহলে, ঝিল-লেগুনে।
কোন সে ম্যাজিক সূর্য-তারায়,
কালপুরুষের রাত-পাহারায়,
মেঘ-মিছিলে কে লিখে যায়
সাতটা রঙের রঙবাহার; ও
কার ইশারায় কুসুম ফোটায়, সাইবেরিয়ায় তুষার গাঢ় !

জেব্রা, জিরাফ, সিংহ যেমন
এবং যেমন উট সাহারায়—
বল্ দেখি কে প্রাণপাখিকে
পুষছে হরেক বুকের খাঁচায় !
চরকি-পাকের তুর্কি নাচন ঃ
বাদশা-ফকির মরণ-বাঁচন,
খুঁজছে তাকেই, খুঁজছে সবাই
লক্ষ বছর কিংবা আরও—
কোথায় থাকেন সেই জাদুকর, সুলুক-মুলুক বলতে পারো ?

ছবি অনুপ রায়

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

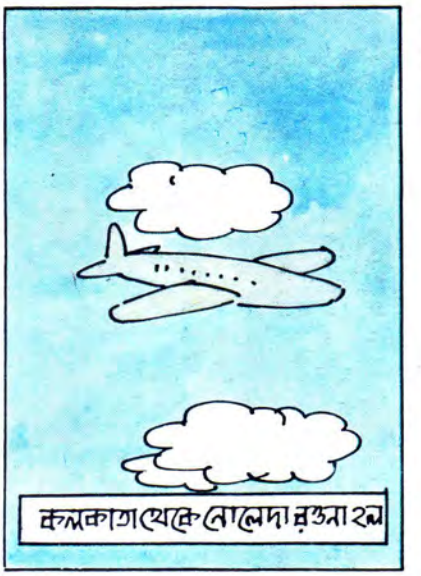

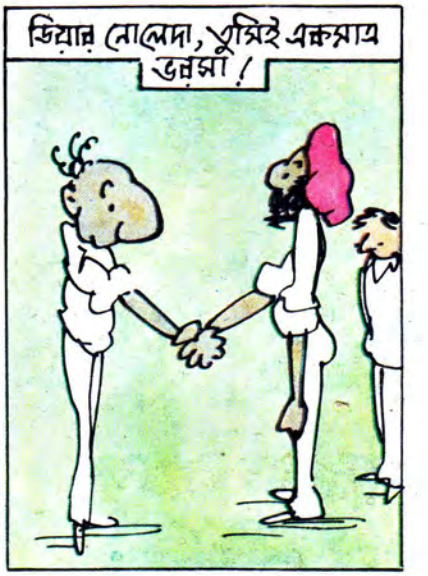

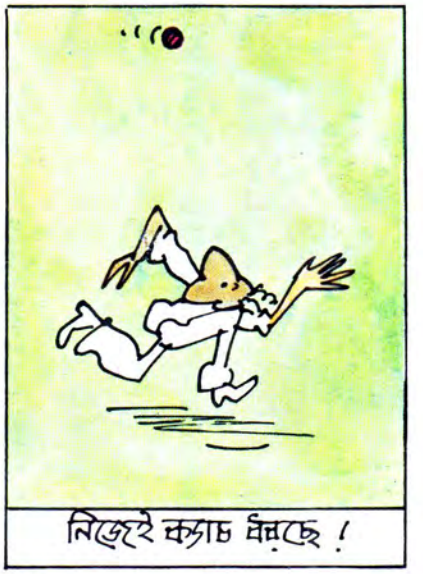

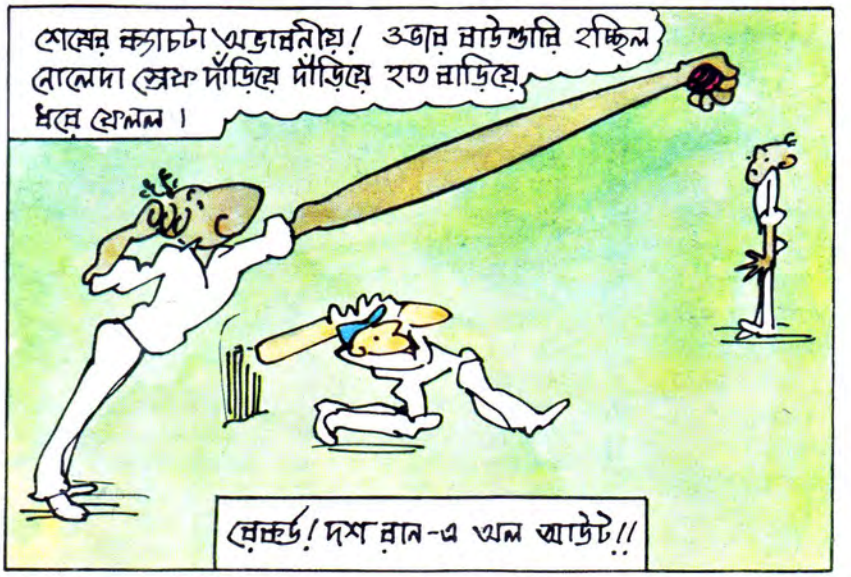

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁকবার সময় কাছ আর দূরের তফাত আঁকায় অনেক সময় বেশ অসুবিধে লাগে। ওপরের নমুনা ধরে কাজ করলে দেখবে, কাছ আর দূরকে এক সঙ্গে ধরা যতটা শক্ত মনে হয়, ততটা মোটেই নয়।

বস্তু তোমার যত কাছে আসবে, ততই আকারে বাড়বে, আর যত দূরে চলে যাবে, ততই ক্রমশ ছোট হয়ে দিগন্তে হারিয়ে যাবে। টানা রাস্তা বা রেলপথের উপরে দাঁড়ালে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই বলে আবার রাস্তা কিংবা ট্রেন লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে যেন ব্যাপারটা পরখ করতে যেও না। সেটা খুব বিপজ্জনক।

এই নিয়ম মেনে চললে দেখবে, আঁকতে কোথাও আটকাচ্ছে না। তবে যে-দিন ওস্তাদ পটুয়া হবে, এই নিয়মের হেরফেরে কোন অসুবিধাই হবে না।

শেখো

কারিগর

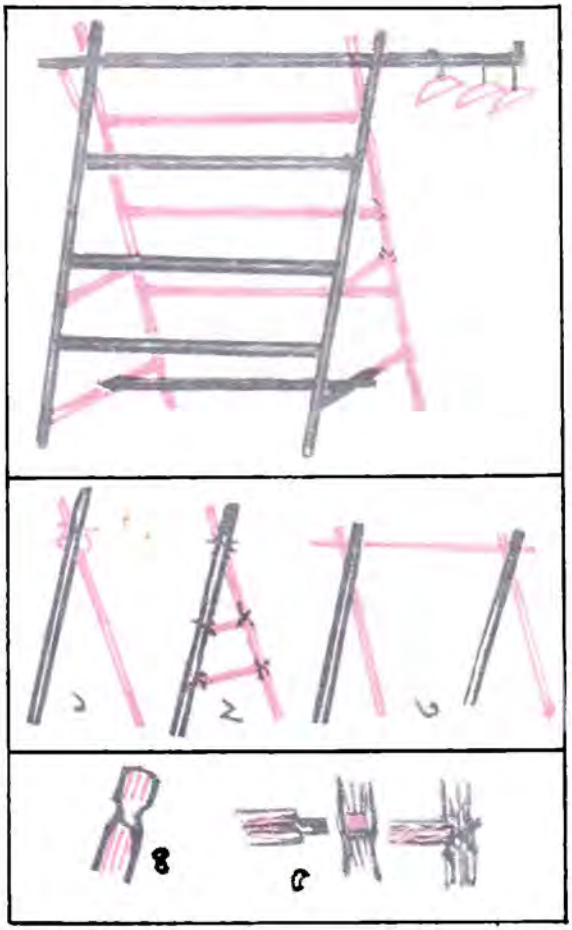

বাঁশের কাজ—আলনা

কাজের জন্যে জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে পাতলা লাঠির মতো গোল বাঁশ যোগ করো।

শুরু করো—নিজের পছন্দ আর দরকার মতো আলনার একটা ছক করে নাও, আর সেইমতো বাঁশের টুকরো কেটে গাগুলো পরিষ্কার করো। এবার উঁচুর দিকের চারটে টুকরো দুটো করে মাথার কাছে ইঞ্চি চারেক বাদ দিয়ে (১নং চিত্র) বেঁধে আড়ের (২নং চিত্র) টুকরোগুলোও বেঁধে নাও। এবার এই বাঁধা দুটো অংশকে মাপমতো দূরত্বে রেখে মাথার অংশে লাঠি ফেলে (৩ নং চিত্র) বেঁধে ফেললেই আলনা দাঁড়াবে। এবার অন্য সব টুকরো তোমার নকশা-মতো বাঁধলেই দেখবে আলনা শেষ হয়েছে। এই ধরনের কাজে দুরকম বাধা চলতে পারে। প্রথম, লাঠির গায়ে খাঁজ কেটে পিনে বাঁধা (৪ নং চিত্র), আর দ্বিতীয়, গর্ত কেটে গেঁথে বসানো (৫ নং চিত্র)। কাঠির মুখ সরু করে নিয়ে যেখানে বসবে সেখানে বাটালি দিয়ে মাপমতো গর্ত করে গুঁজে দিলেই হবে। আলনায় পেরেক ব্যবহার করলে জং ধরার ভয় থাকবে। সবচেয়ে ওপরের লাঠির (মূল নমুনা-চিত্র) যে-কোনো দিকে বড় রাখলে জামা ঝুলিয়ে রাখার জন্য হ্যাঙ্গার ব্যবহার চলবে। শুধু লাঠির শেষের দিকে এমন কিছু করে নাও যাতে হ্যাঙ্গার পিছলে না পড়ে। কাজের শেষে মনের মতো রং করলে বাহার হবে।

জেনে রাখো—(১) আলনার বাঁশের গায়ে সামান্য খোঁচ থাকলে কাপড় ছিঁড়তে পারে। (২) নীচের চার পায়ায় রবারের খাপ লাগালে শব্দ হবে না, পিছলেও যাবে না। (৩) গায়ে খাপ কেটে বসানোর সময় ফেভিকল আঠা ব্যবহার করলে শক্ত হবে। (৪) বাঁশ সব সময় বেছে নেবে—যাতে ঘুণ না ধরে। (৫) আলনা বাঁধার জন্য তার ব্যবহার না করে পাট দড়ি বা নাইলন দড়ি ব্যবহার করো।

ANANDAMELA Regd. No. WB|CC 264

আনন্দমেলা। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮। দেড় টাকা

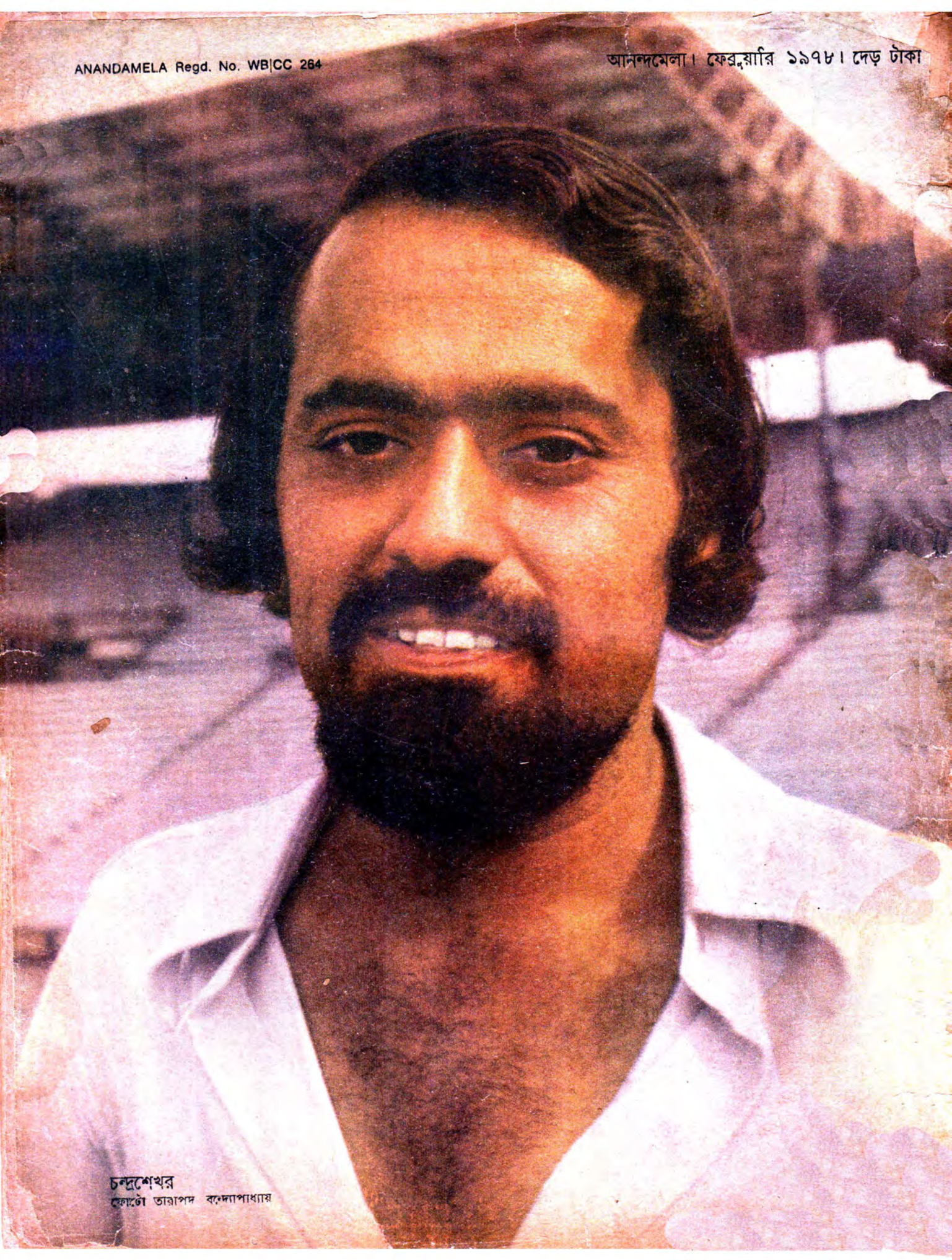

চন্দ্রশেখর
ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়